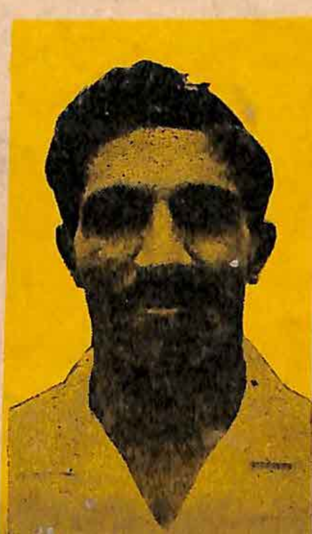





ভারতীয় ফুটবল



চিরঞ্জীব


ভারতীয় ফুটবল

চিরঞ্জীব

জ্ঞানতীর্থ
প্রকাশক
১নং বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৭৪ সাল

ঐতিহাসিক ৯ই আগষ্ট, ১৯৬৭

দাম : তিন টাকা

প্রকাশিকা : ববিটা দাস, জ্ঞানতীর্থ ১, বিধান সরণী,
কলিকাতা-বারো।

মুদ্রাকর : পরাণ চন্দ্র ঘোষ, পরাণ প্রেস ১১৭, তারক প্রামাণিক
রোড, কলিকাতা-ছয় এবং সরোজ কুমার রায়,
১২, বিনোদ সাহা লেন, কলিকাতা-ছয়।

ফুটবল প্রিয়দের জন্য

পাঠকদের প্রতি

কখনও 'নখদর্পণে', কখনও বা উদীয়মানে—কলকাতা ও ভারতের ফুটবল নায়কদের নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার মাঠ-ময়দানে ফিচার লিখতে গিয়ে অনেকের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। সকলেই একান্তভাবে পরিচিত, তাই অনেককে নিয়ে লিখেছি। ইচ্ছে ছিল যাঁদের সম্পর্কে লেখা হয়নি, অথচ হালফিল ভারতের ফুটবল আসরে যাঁরা অনন্য তাঁদেরও স্থান হবে 'ভারতীয় ফুটবলে'। কিন্তু জ্ঞানতীর্থের কর্ণধার কানাইবাবুর ব্যস্ততায় এ পর্বে তা সম্ভব হল না। ভারতীয় ফুটবলের প্রথম পর্বে তাই অনেকে বাদ রইলেন। পরবর্তী পর্বে ওদের কথা লিখব। অবশ্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাতদের কেউ কেউ স্থান পেলেন। কিন্তু তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য, প্রতিভাধর। সুতরাং ছোট দলের খেলোয়াড় বলে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই 'ভারতীয় ফুটবল' প্রকাশিত হল।

তবে এর উৎস আনন্দবাজার পত্রিকা। এদেশে ইতিপূর্বে আর কেউ এমনভাবে এদের ইন্টারভিউ ছাপার ব্যবস্থা করেন নি। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ অমিতাভ চৌধুরী, মতি নন্দী ও শ্যামল কুমার চক্রবর্তীর কাছে। 'ব্রেবোর্ণ থেকে ইডেনে' ও 'বিশ্বফুটবল' প্রকাশের পর কানাইবাবু আবার খেলার বই ছেপে নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ামোদীর শ্রদ্ধাভাজন হবেন।

অপরাজিতা, ইন্দিরা, কোকো ও চিন্ময়—এদের সহযোগিতায় ভারতীয় ফুটবলের প্রকাশের কাজ তরান্বিত হয়েছে।

চিরঞ্জীব

ভারতীয় ফুটবল (দ্বিতীয় পর্ব যন্ত্রস্থ)
ব্রেবোর্ণ থেকে ইডেনে
বিশ্ব ফুটবল

॥ ভারতীয় ফুটবল ॥

[illegible]



এখানেও কলকাতার মাঠের এবারকার বহুবন্দিত খেলোয়াড় পাপ্পানা।
বল ধরেছেন খিদিরপুরের গোলরক্ষক এ. বোস।



মহামেডানের প্যাপ্পানা বল নিয়ে এগিয়েছেন। ধরতে যাচ্ছেন বাটার গোলরক্ষক।

পি. কে. ব্যানার্জী

এ্যাণ্ড দ্যাট ইজ দ্য টারনিং পয়েন্ট···। না হলে বাবা ব্যবসায়ের জন্যে যখন আদ্রায় সব ঠিক করে ফেলেছেন আমরা চলেছি আদ্রার দিকে—তখন সে যাত্রা জামশেদপুরে গিয়ে শেষ হল কেন? রেল শহরের বদলে কেন আমরা ইস্পাত নগরী বেছে নিলাম?

"এ যেমন হঠাৎ, তেমনি হঠাৎ অদ্ভুতভাবেই সুরু হয়েছিল আমার জীবন।"

কথাগুলো সব পি কে-র মুখ থেকে শোনা। কাইজার স্ট্রীটের টি ফরটি ফাইভের দোতলায় নিভৃতে বসে সেদিন গড় গড় করে স্মৃতিচারণ করেছিলেন ভারতের অন্যতম সেরা ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জী।

* * *

খেলার জন্যই চাকরি। প্রদীপ তখনও পি. কে হননি। ভাল এ্যাথলীট, ভলিতে দলের সেরা, তবে ফুটবলে কেমন যেন যাদু আছে। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। কিন্তু বয়স আঠারো হয়নি। হঠাৎ ষ্টীলের সায়েব সুবোরা এসে দরবার সুরু করলেন—প্রদীপকে দিন, আমরাই ওকে চাকরি দেবো, বয়সের জন্য আটকাবে না।

বাবা প্রভাতবাবু প্রায় এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন।

'দুরন্ত' ছেলে প্রদীপ এর আগেই দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল এবং এ কারণেই সে মাত্তর ষোল বছর বয়সে জামশেদপুর স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশনের হয়ে কলকাতায় আই-এফ-এ শীল্ড খেলে গিয়েছে। উনিশ শো তিপান্নে প্রদীপ হলেন পি. কে। বিহারের হয়ে ন্যাশনালে অংশ গ্রহণ করলেন। মাদ্রাজের বিরুদ্ধে একমাত্র গোল করে বাংলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। প্রথম

দিন কোন রকমে ড্র হল। দ্বিতীয় দিনেও তাই। উভয় পক্ষই একটা করে গোল দিল। খেলা সমাপ্তির ছত্রিশ সেকেণ্ড আগে গোল শোধ করলেন পি. কে। এ্যাণ্ড এ্যানাদার টারনিং পয়েন্ট।

*   *   *

বন্ধু-বান্ধবরা সবাই ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। কিন্তু পি. কে একাকী মোহনবাগানের। তিপ্পান্নতে তিনি সাপোর্টার নন—একেবারে মেম্বার এবং ঐ দলের খেলোয়াড়ও। এদের হয়ে প্রথম খেললেন ইম্ফলে। মোহনবাগানের পর এরিয়ান্সে, তারপর চুয়ান্নর আগষ্টে ইষ্টার্ণ রেলে। সেই থেকে পি. কে আজও ঐ দলের খেলোয়াড় এবং হয়তো তার চাইতেও বেশি। এখন তিনি ইষ্টার্ন রেলের জন সংযোগ বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মী।

*   *   *

খেলার মাঠে পি. কে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মানুষ। খেলা ধ্যান, খেলা জ্ঞান হলেও তার দৃষ্টি ঐ গোলপোষ্টের দিকে অর্থাৎ গোল দিতে পারলেই ষোলকলা পূর্ণ। রেলের হয়ে যেমন তিনি ডি. সি এম, ডুরাণ্ড, আই, এফ, এ শীল্ড ও লীগ খেলেছেন, তেমনি আবার ঢাকা, রোম ওলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, মার্ডেকা প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উনিশ'শো পঞ্চান্নের পর যে কবার তিনি ভারতের হয়ে বিদেশে খেলেছেন, তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলদাতা। শুধু তাই নয়, অফিসিয়ালি তিনি এগার বছর খেলছেন এবং এদিক দিয়ে তিনি রেকর্ড করেছেন।

*   *   *

প্রদীপের ফেভারিট টীম হাঙ্গেরী ও ইউ এস এস আর। তবে ইউ এস এস আর-য়ের ট্রেনিং ব্যবস্থা সব চাইতে ভাল, এমনকি ব্রেজিলের চাইতেও। "প্লেয়ারদের মধ্যে কিন্তু ব্রেজিলের লেফট ইন পেলের খেলাই আমার ভাল লাগে" বললেন প্রদীপ। বিদেশী

টীমগুলোর সাথে খেলার সুযোগ পেলে ভারতীয় দল উন্নত হবে এবং ওদের সমকক্ষ হতে পারবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ফুটবলে বাংলা দেশ ভারতের সেরা এবং বাংলা দলগুলোর নতুনদের মধ্যে মোহনবাগানের অশোক চ্যাটার্জী, ইস্টবেঙ্গলের অসীম মৌলিক, বি, এন, আর, এর এ্যাণ্টনী আর ইষ্টার্ন রেলের কাজলের ভবিষ্যৎ খুব সম্ভাবনাময় বলে তিনি জানালেন। তবে সব কিছুর উপরে নিষ্ঠা ও সাধনা। এবং এজন্যই তিনি আজও নিয়মিত দেড় ঘণ্টা করে প্র্যাকটিশ করে চলেছেন।

ফুটবল সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লেখারও ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। তবে খেলা থেকে অবসরগ্রহণ না করে তা নাকি সম্ভব নয়।

ময়নাগুড়ির (উত্তরবঙ্গ) ছেলে প্রদীপ কিন্তু আজও একরোখা, তা যেমন মাঠে তেমনি রাজপথে স্কুটার চড়েও। তাই মায়ের আজও একমাত্র চিন্তা কখন প্রদীপ বাড়ী ফিরবে আর খেলার মাঠে কখন তার খেলা শেষ হবে। ছ'ভাই আর এক বোনের মধ্যে প্রদীপ বড় হলেও মা—পরিমল ব্যানার্জীই হেড অব দ্য ফ্যামিলি। তেষট্টি সালে বিয়ের পরও পি. কে ইষ্টার্ন রেলের ক্যাপ্টেন রয়েছেন ঠিক। কিন্তু বাড়ীতে তাঁর স্থান তৃতীয় হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন স্ত্রী আরতি।

[মেলবোর্ণ ও রোম (অধিনায়ক) অলিম্পিক সহ মোট ৮৪টি সরকারী ও বেসরকারী আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ও গোল দিয়েছেন ৬০টি। গতবছর তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন।]

১৬ই ফেব্রুয়ারী। ১৯৬৫.

জার্নেল সিং

স্থান – মোহনবাগানের তাঁবু। পরদিন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্ট-বেঙ্গলের সঙ্গে 'সম্মুখ রণ'। কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যময় ক্লাব মোহন-বাগানের অধিনায়ক জার্নেল সিং। তাই কিছু কিছু সমালোচনা শোনা গেলেও কর্মকর্তারা ওতে কর্ণপাত করেন নি। কেননা, জার্নেল আপনগুণেই অধিনায়ক। অধিনায়ক বাংলা, ভারত ও এশিয়ান অলস্টারেরও।

কিন্তু মোহনবাগানের তাঁবুতে ওকে এমনভাবে দেখবো আশা করি নি। জামা, পাগড়ী, জুতো, মোজা—কিছু ছিল না। শুধু একটি হাফপ্যান্ট। বেঞ্চে বসে জার্নেল টিফিন করছিলেন। তার আগে প্র্যাকটিশ শেষ করে ফিরেছেন। অন্য সকলে চলে গিয়েছেন। জার্নেল থাকেন হোটেলে। তাও কাছাকাছি। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—গনেশ এভিনিউয়ের ক্রশিংএ ব্রডওয়ে হোটেলে। তাও একাকী। সুতরাং অত তাড়া নেই। তদুপরি আগামী কাল কাকে, কাকে নিয়ে টীম হবে এ সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে। জার্নেল তাই যান নি। স্যুপ খাওয়া শেষ্ করে, টপাটপ কলাদুটা মুখে পুরে, ইশারা করে ওখানে বসতে বললেন।

ক্যাপ্টেন ভেবেছিলেন "আমার বোধ হয় টিকিটের প্রয়োজন।" কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ তুলতেই ওঁর সব ভ্রম কাটলো।

জার্নেলকে পরের দিনের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার অনুরোধ জানাতে বললেন ঃ নেহী! ও সম্পর্কে কোন রকম মন্তব্য করবেন না। তবু বললেন ঃ রেজাল্ট আচ্ছা হোবে! মোহনবাগান পরদিন জিতেছিল।

সত্যিই যা বলেন, তাই-ই করেন, করতে পারেন। কোচ

ফ্লটলে তাই বলেছিলেন—জার্নেল ইজ এ রোভিং সেণ্টার হাফ। রহিমও এঁকে উইথড্রয়াল সেণ্টার হাফ করতে চেয়েছিলেন। ফিফার প্রেসিডেণ্ট স্যার স্টানলী রাউজের মতে "জার্নেল এশিয়ার সেরা স্টপার"।

অথচ হকিতে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ হলেও ফুটবলে এতকাল ছিলেন পশ্চাতে। কিন্তু আজ একলা জার্নেল সিং ধীলন সে কলঙ্ক মোচন করলেন। কলকাতায় আসেন ১৯৫৮-য়, রাজস্থান এনেছিল। জার্নেল তারও আগে যখন ছাত্র, আমি এর স্কুল জীবনের কথাই বলছি। ভীষণ ঝোঁক ফুটবলে। অবশ্য খেলাধূলা বাবা ও কাকার সূত্রে পাওয়া। কাকা নামকরা এ্যাথলেট, বাবা অজগর সিং ও ঐ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন।

জার্নেল স্কুলে খেলতো রাইট-ইন-এ, তারপর সেণ্টার হাফ। জলন্ধর খালসা কলেজে পড়ার সময় কলেজ ছাড়াও ওখানকার খালসা স্পোর্টিংএ তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক। পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুরের ছেলে আজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও সুপ্রতিষ্ঠিত। এশিয়ান অলষ্টারের দুইবার অধিনায়কত্ব করে জার্নেল সে প্রমাণ দিয়েছেন।

জার্নেল যথার্থই "রক্ষণ-ভাগের স্তম্ভ ও আক্রমণ ভাগের উৎস", বাংরবার তিনি এ প্রমাণ দিয়েছেন। দেশে বা বিদেশের মাঠে জার্নেলকে যারা দেখেন তারাও এর প্রমাণ অনেকে দেখেছেন। দেখেছেন স্টপারও বিপক্ষদলের গোলের মুখ পর্যন্ত বল যুগিয়ে আসেন কী করে। রাজস্থান থেকে ১৯৫৯-এ মোহনবাগানে এসেছিলেন জার্নেল এই গুনেই। তারপর থেকেই পাঞ্জাব সরকারের এই অফিসারটি মোহনবাগান, বাংলা, ভারত ও অলষ্টারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বল জার্নেলের পায়ে পড়লে বিপক্ষ দলের সকলে দূরে সরে যান। দর্শক-সমর্থক ও তার সমর্থকরা বলেন, ভয়ে কেউ কাছ ঘেঁসে না।

সবচেয়ে বড় কথা—তার দম অফুরন্ত। এবার এশিয়ান অলষ্টার খেলে আসার পর আমায় বলেন, ৯০ মিনিটের বেশিও ওখানে খেলতে পারতাম"। এছাড়া ক্ষিপ্রতা, দুপায়ে সমানে জোর, ধৈর্য, মনোবল প্রভৃতি তাঁর মতো একালে ভারতে আর কার আছে তা বিচার্য বিষয়।

আরও উল্লেখযোগ্য তিনি নিষ্ঠাবান। ভীষণভাবে ডিসিপ্লিন মেনে চলেন। আমি কখনও তাঁকে ধূমপান করতে পর্যন্ত দেখিনি। সময়মতো ঘুমুতে যান, রুটিনমতো আহার করেন। রোজ ব্যায়াম করেন।

ফুটবলের জটিল বিষয় নিয়েও একাধিকবার তার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তার মতে নিয়মিত এবং সারা বছর অনুশীলনের ব্যবস্থা না হলে কিছুতেই ফুটবলের উন্নতি হতে পারে না। তিনি পেশাদারী ফুটবল চালু করার পক্ষেই। "তাছাড়া ভারতকে বিদেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে এ ব্যতীত উপায় নেই।" বলছিলেন, নৈশ ফুটবলও চালু করতে হবে, আয়ত্ত দরকার—ফুটবলারদের বাইরের খাঁটুনা কমানো। অফিসে চাকরি করে তারপর সপ্তাহে চার বা পাঁচটি ম্যাচ খেললে এবং তার পরও যদি প্রয়োজনীয় ফুড না পাওয়া যায় এরা কী শক্তি নিয়ে মাঠে নামবে।

জার্নেল প্রত্যেকটি স্কুলের খেলার মাঠ থাকা অবশ্যই দরকার বলে মন্তব্য করেছেন। "ভাল প্লেয়ার বাছাই করতে হবে ওদের মধ্য থেকে, তারপর ক্যাম্প করে সেখানেই পড়াশুনা, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা, নইলে ফুটবলে ভারত আরও পিছিয়ে যাবে।"

৩

পিটার থঙ্গরাজ

শুধু গোলকীপারদের মধ্যে নয়, এশিয়ান অলস্টারে এবার 'সব থেকে লম্বা ছিলেন পিটার থঙ্গরাজ। ভারতীয় ফুটবলের এই কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড় এখন বহির্ভারতেও খ্যাত। তবুও এবার অলস্টার অমনভাবে ৭—০ গোলে ও ৩—০ গোলে হারল কেন? অলস্টার খেলে ফেরার পর অধিনায়ক জার্নেলের কাছে ইণ্টারভিউ নিতে গিয়ে বারংবার আমার এই কথাই মনে হয়েছিল। কৌতূহল মেটাবার জন্য জার্নেলকে প্রশ্নও করেছিলাম—তাঁর মত গোলকীপার ৭—০ গোলে পরাস্ত হলেন কী করে। জার্নেল বলেছিলেন, 'কিছু ভী ছিল না।' না, কম্বিনেশন, ম্যাচের আগে প্র্যাকটিশই বা কোথায়? জানালেন—ফুটবল তো একলার খেলা নয়—এগারজন নিয়ে টীম। সুতরাং ৭ গোলের জন্য শুধু থঙ্গরাজ দায়ী নন, যৌথভাবে আমরাও।

সত্যিই পিটার রামস্বামী থঙ্গরাজ এশিয়ার অদ্বিতীয় গোলকীপার। কেউ কেউ একে বিশ্বের অদ্বিতীয় লেভ ইয়াসিনের (দ্রষ্টব্য: "বিশ্বফুটবল") সঙ্গে তুলনা করছেন। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কালকেতু'ও লিখেছিলেন—"কয়েকদিন আগে ১৯৬৩ ইংল্যাণ্ড বনাম বিশ্বএকাদশের খেলার ফিল্মটির অংশ বিশেষ আবার দেখলাম অমল দত্তর বাড়িতে। অবিশ্বাস্য পর্যায়ে উঠেছে, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। আমার মনে পড়ে না, ১৯৬১তে কলকাতায় আসার পর থঙ্গরাজের এমন ধরণের গোলকীপিং দেখেছি বোধ হয় অন্যায় বললাম। ১৯৬৫ শীল্ড ফাইন্যালে আর ব্রাতিশ্লাভার বিরুদ্ধে থঙ্গরাজকে ইয়াসিন মনে হয়েছে।"

আরও লিখেছেন: থঙ্গরাজের সঙ্গে আমার আলাপ চলছিল,

ওর অফিসের একটি খেলার ফাঁকে ফাঁকে তালতলা মাঠে। তখন ওধারে মোহনবাগান মাঠে ফ্যাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল খেলছে।

"এই রকম এগিয়ে যাওয়া"—বলতে বলতে থেমে গেলাম। বিপক্ষের লেফট হাফ চমৎকার থ্রু দিয়েছে রাইট আউটকে। থঙ্গরাজ তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন। রাইট আউট পৌঁছবার আগেই বলে পৌঁছে গেল ওর পা। বল গিয়ে পড়ল পুলিশ মাঠে। নিজের ব্যাক্‌কে কী যেন নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসে বললেন, "এই রকম এগিয়ে যাওয়া, এ্যাডভানসিং, থ্রোয়িং দুটোই শিখেছি ইয়াসিনের খেলা দেখে ১৯৫৬-য় মেলবোর্ন অলিম্পিকে।"

ইয়াসিন যাঁর আদর্শ, ইয়াসিনের সঙ্গে তুলনা করে যাকে বলা হয় ইনি ভারতের ইয়াসিন—তিনি যদি সহজে পরাস্ত হন ; ৭—০ গোল তার উপস্থিতিতেই হয়ে যায়, তাহলে অবাক হতে হয় বৈকি !

দৈর্ঘে ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। চমৎকার ইংরেজী বলেন, স্পষ্টভাষী, একটু গম্ভীর প্রকৃতির। অর্থাৎ সব কিছুতে ব্যক্তিত্বের চাপ। আন্তর্জাতিক খেলছেন প্রায় একযুগ আগের থেকে। প্রদীপ ব্যানার্জী ও থঙ্গরাজ একসঙ্গে ঢাকায় ১৯৫৫-তে কোয়াড্রাঙ্গুলার খেলে এসেছেন।

এখন বয়স প্রায় বত্রিশ। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য। কুড়ি পঁচিশ বছরের ছেলেরা যা না পারে, থঙ্গরাজের কাছে তা জলভাত্। যত ঠাণ্ডাই থাকুক না কেন—শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই রোজ ভোরে স্নান চাই। ভোর সাড়ে চারটেয় ওঠেন। থঙ্গরাজের এ অভ্যেস ১৯৫১ থেকে। দশ বছর মিলিটারীতে কাজ করেছেন।

থঙ্গরাজের মধ্যে ব্যতিক্রম আরও। রোজ ভোরে এই মিলিটারী ম্যান এখনও প্রার্থনায় বসেন। তার পায়ের মাপে কোথাও রেডিমেড জুতো পাওয়া যায় না, তাই অর্ডার দিতে হয়।

সৈন্য বিভাগ ছেড়ে কলকাতায় আসেন ১৯৬১তে। তার আগে চাকরিসূত্রে খেলতেন, মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টারে। এখন দুই



চিরকালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গলের খেলা।
ইষ্টবেঙ্গলের গোলের সামনে শান্ত মিত্র, অশোক চ্যাটার্জী ও নাঈম।



আরেকটি খেলায় বল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন
কাম্নান ও সুকুমার সমাজপতি।

ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। কলকাতায় এসে প্রথম দু'বছর মহামেডান স্পোর্টিং, তারপর মোহন্‌বাগান ও এখন (৬৫ থেকে) ইস্টবেঙ্গলে। মেলবোর্ণ ও রোম অলিম্পিকে ছিলেন। ১৯৬২-র এশিয়ান গেমস তো আছেই। এশিয়ান পদক ছাড়াও সন্তোষ ট্রফির বিজয়ী পদকও তার অধিকারে। অধিনায়কত্ব করেছেন ১৯৫৮-র সার্ভিসেস ও ১৯৬৬তে রেলওয়ের। শুধু অধিনায়কত্ব নয়, কৃতিত্বও ছিল। যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, হয়তো ভুল হল,—যাঁরা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন—দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, সর্বোপরি তার অধিনায়কত্বে খেলেছেন, এক বাক্যে স্বীকার করবেন "এমন অধিনায়ক হয় না"—ইনস্পায়ারিং ক্যাপ্টেন্‌সিপ।

কালকেতুর কথাতেই শেষ করি ; কিন্তু থঙ্গরাজের গর্বের হাসি যদি কেউ দেখতে চান, তাহলে ওর জন্ম সময়ের কথা ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

উত্তর পাবেন : "১৯৩৫-এর ২৪শে ডিসেম্বর রাত একটায়। অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বরের সেই সময়ে যখন ক্রাইস্ট (যীশুখ্রীষ্ট) জন্মান।"

চুণী গোস্বামী

মোহনবাগানে খেলছেন সেই ১৯৫৪ থেকে। সেবার তার আগমনে ভারতের এই ঐতিহ্যপূর্ণ ফুটবল ক্লাবে যেমন কলরোল শোনা গিয়েছিল, আজ সে ধ্বনি শুধু ক্লাবের প্রাঙ্গণে নয়, ক্লাবের কর্মকর্তা, সদস্য বা তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ফুটবলের ইতিহাসে চুণীগোস্বামী ভারতের বাইরেও সুখ্যাত। এক

যুগেরও বেশি ফুটবলের মাঠ-ময়দানে তার আনাগোনা। কখনও টপ্ স্কোরার, কখনও হয়তো মুডের অভাবে ভাল খেললেন না, কয়েকবছর আগেও তার যে ফরম ছিল, আজ সব খেলায় তা না দেখা গেলেও বলার কিছু নেই। কেননা, এদেশে এতবছর ক'জন ফুটবল খেলেন।

হয়তো চুণী গোস্বামী বলেই সম্ভব, আজও তাই মোহনবাগানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তিনি 'অবশ্য 'খেলোয়াড়'। চুণী ছাড়া যেন মোহনবাগান ক্লাব অসম্পূর্ণ। তার অবর্তমানে মোহনবাগান ক্লাব ড্র করলে বা হারলে স্বভাবতঃই সমর্থক মহলে কথা ওঠে—চুণী নেই! জিতবে কী করে! চুণী ছাড়া মোহনবাগান আজও তাই অনেকের চিন্তার বাইরে। ময়দানে তার পায়ে বল পড়লে দর্শক মহলে সাড়া পড়ে যায়। রেডিওর সামনে বসেও শ্রোতামহলে উল্লাস। পি, কে, ব্যানার্জী যদি 'ফুটবলের প্রদীপ' হল তবে চুণী 'শিবরাত্রের সলতে'। কে কত বড় সে বিচার বিদগ্ধ দর্শকরা করবেন। কিন্তু আমি বলবো—দু'জনই অনন্য।

শুধু পরপর মোহনবাগানের নেতৃত্ব নয়। বাংলা বা ভারতীয় দলেরও অধিনায়ক বহুবার। একদা ইস্টবেঙ্গলের লেফট ইনে বলরাম শিহরণ তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় চুণীর আগমন। অনেকে ভাবিত ছিলেন—বলরামের স্থানে কি চুণী আসবে ? বাংলা বা ভারতীয় দল গঠন কালে কাকে বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল চুণীর খেলা। অনেকদিন পর এবার কলকাতায় প্রথম ডিভিশন লীগে বি. এন. আর এর পক্ষে বলরামের দেখা মিললেও তিনি ফুটবলের আসরে প্রায় প্রাক্তনের দলে। কেউ কেউ আবার আমেদ ও সাত্তারের সঙ্গেও চুণীর তুলনা করেন। কিন্তু আমার অভিমত সেই—এক। চুণী গোস্বামী অনন্য!

ধন্যবাদ মোহনবাগানের বলাই চ্যাটার্জীকে! কেননা, তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন, আজকের এই খ্যাতকীর্তিকে।

চুণীর বয়স তখন সম্ভবতঃ পনের। দাদা মানিক গোস্বামীর সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে নিয়মিত খেলতো। সঙ্গে অবশ্য আরও অনেকে ছিল। জুতোর গোলপোস্টে খেলতে, একদিন ঝগড়া বেধেছিল দুই ভাইয়ে। একজন বলল, 'গোল', আরেকজন বলল—'না'। পার্কের বেঞ্চে বসেছিলেন একভদ্রলোক। তাকে সকলে বিচারক মানল। গেল তাঁর কাছে। দশাসই ভদ্রলোক বলঙ্গেন—উহুঁ, গোল হয় নি।

মানিকই জিজ্ঞেস করেছিলেন। বেঞ্চে বসা ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন—গোলপোস্ট থাকলে, বল পোস্টে লেগে ফিরে আসতো। কোচ বলাই চ্যাটার্জী ওখান থেকেই দু'ভাইকে চিনেছিলেন। অতঃপর চুণীর ফুটবল গুরু উনি। চুণীর প্রতিভার সঙ্গে বলাই চ্যাটার্জীর সুদীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার যে সংমিশ্রণ, তাই পরিপূর্ণরূপে চুণী গোস্বামী।

১৯৫৪ থেকে ভারতীয় ফুটবলের এই দিকপাল খেলোয়াড় এপর্যন্ত কত খেলায় অংশ নিয়েছেন, কতবার বিদেশ সফর করেছেন, তার হিসেব চুণী নিজেও দিতে পারেন না। কথায় কথায় বলেন, আচ্ছা ওখানে কী খেলতে গিয়েছিলাম—ফুটবল না ক্রিকেট?

ফুটবলার হিসেবে চুণী সুখ্যাত হলেও, একালে বাংলা বা বাংলার বাইরে ক্রিকেটার হিসেবেও কম খ্যাত নন। মোহনবাগানের ক্রিকেট টীমেও তার অবদান যথেষ্ট। ব্যাট ও বল দুটিতেই সমান। বাংলা বা পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেট টীমে ফুটবলের মতোই তিনি অবশ্য খেলোয়াড়। সেঞ্চুরী করেন, এক ইনিংসে ৫টি উইকেটও নেন—প্রথম শ্রেণীর খেলাতেও।

চাকরি করেন স্টেট ব্যাঙ্কে। অফিসার। সুতরাং তাঁর খেলার আধিপত্য ওখানেও। স্টেট ব্যাঙ্কের পক্ষে একাধিকবার বিদেশ সফর করে এসেছেন। উল্লেখযোগ্য, পত্র পত্রিকার পাতায় তাকে হামেশাই দেখা গেলেও এই খেলোয়াড় কখনও কখনও

আবার লেখক। বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। আনন্দবাজর পত্রিকায় তো একবার খেলার রিপোর্টও লিখেছেন। মাঠ-ময়দানের এই নায়ক কখনও বা রূপালী পর্দারও নায়ক। শেষের দুটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। অন্যান্যের সঙ্গে চুণীও নাকি খবরের কাগজে রিপোর্ট লিখে ও সিনেমায় নেমে 'অপেশাদারী' প্রথা ভঙ্গ করেছেন।

এখানে আমার বক্তব্য ঃ আর কতদিন আমরা অপেশাদার কথাটা শুনবো? অপেশাদারীর নামে যে পেশাদারী (?) চলছে, তা কী যুক্তিসঙ্গত? এর চাইতে সরকারী ভাবে পেশাদারী প্রথা চালু করতে দোষ কোথায়?

অসীম মৌলিক

বাবা নেই। বাড়িতে নিদারুণ অর্থ সংকট। চার ভাই তিন বোনের সংসারে স্থান তৃতীয় হলেও পনের বছরের ছেলে রাতদিন রোজগারের কথা ভাবে। অবশেষে রোজগারের কথা ভেবে পার্ক ইনস্টিটিউশনের ক্লাশ নাইনের ছাত্রকেও অধ্যায়নের তপস্যা ছেড়ে যেতে হ'ল গয়ায়। কৈশোরের নানা রঙের দিন গুলিরও অবসান হল। প্রথমে গিয়েছিস অকূল উদ্দেশ্যে। পরে মিলল চাকরি। কাজ—বয়লারে কয়লা দেওয়া। মাইনে সব সুদ্ধ পঁচাত্তর। 'যা পাওয়া যায় তাই ভাল, নিজের উদর নিবৃত্তি এবং বাড়িতে কিছু পাঠাতে পারলেই হ'ল।'

শুরুতে একটু ভাল লাগত। দারিদ্র্যমুক্তির কথা ভেবে মনটা খুশি খুশি হত। কয়েক দিন না কাটতেই স্কুলের বন্ধুদের কথা, ছুটির পর বইগুলো কোনরকমে বাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে মাঠে যাওয়া,

দিনরাত ফুটবল পেটানো—একে একে মনের কোণে উঁকি দিলে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করতো।' পর মুহূর্তে আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিত—নাঃ চাকরি আমায় করতেই হবে।'

তবুত মন মানল না। ফুটবলের টানে ঘরের ছেলে ফিরে এল ঘরে। এবার চাকরি কলকাতার ন্যাশনাল টোবাকোতে। সিগারেটের কাগজ কাটতে হবে। মাইনে তিরিশ টাকা আর্থিক লাভ না হলেও কলকাতার ফুটবল প্র্যাকটিশের সুবিধা হল। মন দিয়ে অনেকদিন সিগারেটের কাগজ কাটল। মাইনে বাড়ল না। প্রমোশন তো দূরের কথা, ইনক্রিমেন্টও না।

উনষাট পেরিয়ে ষাট সন এল। তৃতীয় ডিভিশনের অ্যালবার্ট ক্লাবের খাতায় একটা নতুন নামের সন্ধান মিলল। অসীমানন্দ মৌলিক—ঠিক যেমন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন; দুঃখের রাজ্যে যে পড়ে আছে তার সঙ্গে যুক্ত 'আনন্দ'। আলোচ্য পরবর্তীকালে দুঃখের অমানিশা কেটে সত্যিই যখন আনন্দ এল অসীমানন্দ মৌলিক তখন অসীম মৌলিক হয়ে গিয়েছে।

থার্ড ডিভিশনে ঢুকে অসীমের উৎসাহ বাড়ল দ্বিগুণ। তাই চাকরির পর ক্লান্ত হয়ে মাঠে নামলে অনেকেই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারতো না। তবুও পেটে থাকলে পিঠে সয়। শুধুমাত্র ফ্যান ভাত খেয়ে কদিন চলে! ভাল চাকরির জন্য হানা দিল দুয়ারে দুয়ারে। বাঁচতেই হবে। ষ্ট্রাগল ফর একজিসটেনস! খেলায় ডবল প্রমোশন হল। থার্ড ডিভিশন থেকে এক লাফে ফার্ষ্ট ডিভিশনে এরিয়ান ক্লাবে। তবে চাকরিতে তা হল না। অতি কষ্টে পূর্ব রেলে একটা ক্যাজুয়াল খালাসীর কাজ জুটলো। মাইনে চল্লিশ টাকা। তাও অফিসে টেবল চেয়ার মোছার কাজ হলেও হতো! এ একেবারে অন্য ধরণের। সময়ে অসময়ে দেখা যেত হওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-গুলিতে কলকাতার ফুটবল ময়দানের ফার্ষ্ট ডিভিশনের প্লেয়ারের

কাঁধে মই। পরনে বেগুনী রঙের হাফ প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট, হাতে ময়লা ন্যাকড়া। মাঝে মাঝে মই লাগিয়ে উঠে যাচ্ছে উপরে—মুছছে এমপ্লিফায়ারগুলো। এ হল চার বছর আগের কথা। এসব স্মৃতি আজকের সফল খেলোয়াড় অসীমকে মোটেই লজ্জিত করে না। গ্যারিঞ্চা, পেলে, ডিভি এরাও তো প্রায় এই অবস্থার মধ্যেই একদা ছিল।

তবুও কোন দুঃখ নেই, নেই কোন হতাশা। দেশবন্ধু পার্কে খেলা দেখে যে অভয়দা, অশোক মিত্র ও নাটুদা ওকে এরিয়ানে নিয়ে গিয়েছিলেন অসীম প্রথম বছরেই তাদের মান রেখেছিল। মোট গোল দিল তেরটা। একষট্টির রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী যেন খালাসীর জীবনে নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে এল। ডি সি এম, ইণ্টার রেল প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ হল। বাষট্টিতে রেলওয়ের হয়ে বাঙ্গালোরে সন্তোষ ট্রফি ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে পাটনা ও গৌহাটিতে প্রদর্শনী ম্যাচ এবং কলকাতার মাঠে কুড়িটা গোল দিয়ে স্মরণীয় হলেও এবং গোটা তেষট্টি সন ভাল খেললেও চৌষট্টি অবিস্মরণীয়। এবার সে কলকাতার টপ স্কোরার। গোল দিল একুশটা। প্রথম বিদেশ যাত্রায় কুয়ালালামপুরে মারডেকা খেলতে গিয়ে থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম গোল করল। ভারত এই খেলায় ২-১ গোলে বিজয়ী হয়।

ফুটবলের জীবনে স্বচ্ছন্দগতি এবং সাফল্য দেখা দিলেও অসীম—দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় পেনাল্টি মিস করে। আজও সেজন্য তার আফশোসের অন্ত নেই। প্রথম ঘটনা গতবারের ডুরাণ্ড ফাইন্যালে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিস করে রাগে, হতাশায় হোটেলে ফিরেই আরাধ্যা দেবী মা কালীর বাঁধানো ছোট্ট ছবিখানা ভেঙে চুরমার করে ফেলেছিল। দ্বিতীয়টি এবার লীগের খেলায় বি. এন. আর-য়ের বিরুদ্ধে। তবে মোহনবাগানের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে

এখনও পারেনি। শেষের দলের বিরুদ্ধে ওই দিনই নেয়। পেনাল্টি মিস করে দর্শকদের ধিক্কারধ্বনি শুনে প্রায় পাগল হয়ে—গিয়েছিল অসীম। সমস্ত সময়টা যেন কি বিরাট একটা বোঝা বয়ে নিয়ে খেলছিল। শেষ দিকে গোলটি দিয়ে অসীম বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শূন্যচোখে। হাজার হাজার দর্শকের জয়ধ্বনিও তার কানে পৌঁছায় নি। হঠাৎ সব বোঝা এমনভাবে নেমে গেল যেন টাল সামলানোই দায় হয়ে পড়েছিল। টলতে টলতে গোল পোষ্টের পাশে ফটোগ্রাফার বাহিনীর সামনে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। হায়, কেউ যদি তখন একটি ছবি তুলে রাখতেন!

প্রায় ছ'ফুট লম্বা, একাত্তর কিলোর এই ছেলেটি চোখমুখ ও দেহের গঠন দেখলেই মনে হবে—এ 'দুর্ধর্ষ'। মাঠে যাঁরা দেখেছেন তারা বলবেন এই বিশেষণের পিছনে স্যুপারলেটিভ ডিগ্রি লাগানো উচিত্।

অসীমের কপাল, মাথা, পিঠ প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য কাটা দাগ। জিজ্ঞেস করেছিলাম—এক সময়ে, কি চুরি ডাকাতি করতেন? বললেন,—ডাকাতি নয়, চুরি। বাবাকে লুকিয়ে ফুটবল খেলতাম এবং শাস্তিস্বরূপ খড়ম ও লাঠি পেটার চিহ্ন এগুলো।

একে আর্থিক অসংগতি, তার উপর বাবার কঠোর শাসন। তা সত্ত্বেও খেলাধূলায় অসীমকে খুব একটা বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। খেলাঘর ক্লাবের জীবনবাবু দিতেন বুট ও অন্যান্য সরঞ্জাম। বন্ধুরা দিতো খাওয়া। এ ছাড়া দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতি ও ভ্রাতৃসঙ্ঘের আনুকূল্য তো ছিলই। পরবর্তীকালে আসে ল্যাংচা মিত্র ও অমল দত্তের সান্নিধ্যে। শেষোক্ত জনের কাছেই আধুনিক ফুটবলের সব কিছু শিখেছে অসীম। অমল দত্তকে তাই বলে 'গুরুদেব।'

একদা যে স্কুল-পালানো ছেলে দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়েও চাকরি পেতনা, আজ সে সহজেই চাকরি ছাড়তে পারে। এরই মাঝে অসীম স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে নিয়েছে। এখন একুশ বছর বয়েস, ভারতের এই উদীয়মান সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব যেমন ফুটবল মাঠে ঠিক তেমনি বাড়িতেও। সংসারের দায়িত্ব পালনে এখন দাদাকে সাহায্য করছে।

ফুটবল ছাড়া সে শিকার করে, মাছ ধরে এবং ক্রিকেটও ভাল খেলে। গত বছর ইউনাইটেড ক্লাবের হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সেন্‌চুরী করেছিল। তাই অসীমের সব ঋতুতেই 'ফ্যান' রয়েছে। বিশেষত, উত্তর কলকাতায়। বিংশ শতাব্দীর আদি পর্বে এই 'উত্তর কলকাতা' ফুটবলের কেন্দ্রবিন্দু হলেও আজ 'দক্ষিণ' তারকা খচিত। সুতরাং পৈতৃকভূমি যশোরের খড়িখালি গ্রাম হলেও অসীমই উত্তরের একমাত্র নামকরা ফুটবলার।

১২ই অক্টোবর। ১৯৬৫

কাজল মুখার্জী

অন্নচিন্তা মেটাতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তারপর ট্রামে-বাসে ঝুলে দিনান্তে বল নিয়ে মাঠে নামলে পেলে-পুশকাস হওয়া যায় না। প্লেয়ারদের উপযুক্ত কমফর্ট চাই। আফ্‌টার কেয়ারের প্রয়োজন খুব।

ঢাকুরিয়ার বাপুজী কলোনীর অসমাপ্ত বাড়িতে বসে কথাগুলো বলছিলেন—কলকাতা ফুটবলের এক প্রতিভাময় তরুণের পিতা দীনেশ মুখার্জি। বললেন, এদেশের খেলোয়াড়রা আগের চেয়ে অনেক সুযোগ সুবিধা পেলেও বিদেশের তুলনায় কিছুই হয়নি।



বল নিয়ে এগিয়েছেন চুনী গোস্বামী, বিপদ বুঝে হাতে না ধরে জর্জ টেলিগ্রাফের গোলরক্ষক পা দিয়েই বল ক্লিয়ার করলেন।



কে. ভি. শর্মা বলটি মেরেছিলেন। কিন্তু না।
গোল হল না।

ওদের যাতে খাওয়া পরার চিন্তা কদাচ না করতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ফুটবলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এ ছাড়া ফুটবলের উন্নতি হতে পারে না।

দীনেশবাবু ফুটবল ভালবাসতেন গোড়া থেকেই। তখন বিক্রমপুরের গাঁয়ে শীতের সময় ধানকাটার পর মাঠগুলোয় যে খেলা হতো দীনেশবাবু তাতেই আনন্দ পেতেন। কিন্তু ওকথা আজ স্মৃতি।

মায়া কাটাতে না পারায় বোধহয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। কেননা ১৯৫৯—৬০ সনে মোহনবাগানের পাওয়ার লীগে খেলত কাজল। তারপর গিয়েছিল ইষ্টার্ণ রেলে। প্রশান্ত সিন্হার মতো সেও 'চাকরিতে মতান্তরের জন্য ওই রেল ছেড়েছে। তবে চাকরি নিয়েছে অন্যত্র, রেলের বৈদ্যুতিকরণ বিভাগে।

সেলিমপুর বয়েজ ক্লাবের কালা গুপ্ত মাত্র দশ বছর বয়সে ফুটবলে হাতে খড়ি দেন কাজলকে। সেও উঠি পড়ি করে লেগেছিল 'ফুটবলে বড় হতেই হবে।' অতঃপর কয়েক বছরের মধ্যেই কর্তাব্যক্তিদের চোখে পড়ে কাজল আটান্ন ও উনষাটে দিল্লী এবং আগরতলায় ইণ্টারষ্টেট স্কুল গেমস খেলেছে।

ছোটবেলায় খেলার দিকে নজর বেশি থাকলেও পড়ায় অবহেলা করত না। কিন্তু দারিদ্র তাকে স্কুল ছাড়িয়ে চাকরি মুখো করল। ষাটে বাঘা সোম নিয়ে এলেন ইষ্টার্ণ রেলে। খেলার জন্য চাকরি হল পরের বছর থেকে। ওই বছর থেকে খেলেছে অনেক। শীল্ড-লীগ—ডুরাণ্ড তো আছেই। পেনাঙে এশীয় যুব ফুটবলও খেলে এসেছে। চৌষট্টিতে এশিয়ান কাপে হংকং-য়ের বিরুদ্ধে নেমেছিল বিদেশের ময়দানে।

ছ'ভাই একবোনের মধ্যে কাজল প্রিয়তো বটেই, এমন কি বাইরেও জনপ্রিয়। মোহনবাগানের খেলার দিন তাই ভোর

থেকেই বাড়িতে ও বিকালে ক্লাবে 'ডে-শ্লিপের' জন্য কিউ পড়ে যায়। উল্লেখযোগ্য ঃ ডাক পিওন রোজ অনেক চিঠি দিয়ে যায়, দুঃখের বিষয় অলকাপুরী বা নন্দনকানন থেকে কেউ লেখেন না। পত্রদাতারা সবাই ফুটবল পাগল ছেলের দল।

হক কথা এদের অনেকেই বোধহয় কাজলকে দেখেনি। কারণ কারুর কারুর প্রশ্ন ঃ আপনার রং কেমন? চুল কেমন? বয়স কত? লম্বা না বেটে? হবি কী? কী পড়তে ভালবাসেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাজল উত্তর দেয় কিনা জানিনা তাই আমি তাদের জানাচ্ছি—কাজল ফর্সা, ক্রুকাট চুল, বয়স বাইশ, উচ্চতা মাঝারি, হবি কয়েন-কালেকশন এবং গোয়েন্দা গল্প না পড়লে ঘুমই পায় না॥

[কাজল এখন আবার ইষ্টার্ণ রেলে ফিরে গিয়েছে]

২০শে জুলাই '১৯৬৫

সি. মুস্তাফা

স্কুলের ছাত্র। খেলার নেশাও অতিমাত্রায়। সেবার ওদের সঙ্গে একটা ভাল টীমের খেলা। দুটো টীমই এসে গেল। কিন্তু নিজেদের গোলকীপার বেপাত্তা। অবশেষে ঘাটের কাছে এসে তরী ডুববে। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কে গোলে খেলবে? ক্যাপ্টেনের মাথায় হাত। গোলকীপার তো দূরের কথা—দশ জনের বেশি প্লেয়ারই নেই। পাশে ফ্যাল ফ্যাল চোখে দাঁড়িয়েছিল কালো ঢ্যাঙা ছেলেটি।

ওই তো প্লেয়ার রয়েছে—চেঁচিয়ে উঠল একজন।

কোথায় খেলবে? শুধোলেন ক্যাপ্টেন।

—যেখানে খুশি।

—তাহলে গোলেই খেল।

তথাস্তু বলে নেমে গেল। অনেক দারুণ দারুণ বল এল এবং পাকা গোলকীপারের মতন সব ঠেকাল। ওই থেকে সে গোলকীপার এবং আজ কলকাতার মাঠ ময়দানে যে ক'জন সেরা গোলকীপার রয়েছেন সেদিনকার ওই কালো ঢ্যাঙা ছেলেটি তাদেরই অন্যতম। গত শনিবার মোহন বাগানের বিরুদ্ধে ওর খেলা দেখে সকলে বলেছেন—মুস্তাফা না থাকলে মহামেডান অনেক গোলে হারত।

নাম : সি. মুস্তাফা। বয়স একুশ। খেলাসূত্রে এখন কলকাতার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটের বাসিন্দা হলেও জন্মস্থান আরেক নোনাজলের দেশে—উত্তর মালাবারের কান্নানোরে। কান্নানোর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে নীচু ক্লাশে পড়বার সময় মুস্তাফার খেলায় হাতেখড়ি। তখন সে এগার পেরিয়ে বারোয় পড়েছে। খেলতো সেণ্টার ফরোয়ার্ডে। তারপর সিনিয়র টীমে প্রমোশন পেয়ে পিছিয়ে এল ব্যাকে। তারপর আরও পেছিয়ে—গোলে গিয়ে খেলা খুলল। আটান্নয় মুস্তাফাকে দেখা গেল রাজধানীর খেলার আঙ্গিনায়—ইণ্টার ষ্টেট স্কুল টুর্ণামেণ্টে কেরল দলের পক্ষে। একষট্টিতে সন্তোষ ট্রফিতে চান্স পেল মাত্র ষোল বছর বয়সে। ওই বছর সর্ব প্রথম 'সাপাঙ্গী' ট্রপি জয় কেরল দলের আরেক কৃতিত্ব। ন্যাশনালে ভাল খেলার জন্য ডাক পড়ল দক্ষিণ ভারতীয় একাদশের হয়ে ভারত-ভ্রমণরত ষ্টুট্গার্টের বিরুদ্ধে খেলতে। একষট্টি থেকে কেরলের গোলকীপারদের একচ্ছত্র অধিপতি হলেও মুস্তাফার মন ছিল ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতায়। ইচ্ছাপূরণ হল তেষট্টিতে। মহঃ-স্পোর্টিংয়ের জেনারেল সেক্রেটারী এনায়েতুর রহমানের আহ্বানকে মুস্তাফা উপেক্ষা করতে পারল না।

"পড়াশুনা শেষ করবার আগে তোমাকে কিছুতেই কলকাতায় যেতে দেব না"—বললেন বাবা ভি হোসেন কুট্টি হাজি। বাবা এবং

ছেলে দুজনকেই বোঝান শুরু হল। আত্মীয়স্বজনরা কেউ গেলেন বাবার পক্ষে। অবশেষে কেরলের সেরা গোলকীপারের কাছে পিতাই পরাজিত হলেন।

মুস্তাফা কলকাতায় এসে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গতবার ডি সি. এম জিতে এসেছে। গৌহাটীতে বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশীপে বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় সি. মুস্তাফা নামটাই ছিল সকলের আগে। উল্লেখযোগ্য: কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্সের এই ছাত্রটি এবার বি-কমের ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষা দিয়েছে।

তোমার এ্যাম্বিশন কি—জিজ্ঞেস করেছিলাম মুস্তাফাকে।

উত্তরে বলল—বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করব—এই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশা এবং গতবার মার্ডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলে—সে আশা পূর্ণ করেছি।

কলকাতার বাসিন্দা হলেও মুস্তাফা অন্যদের মতন বাংলা জানে না। ইংরেজি ও হিন্দীতেই কথাবার্তা চালায়। আর দেশের লোক পেলে মাতৃভাষা মালায়লমে কথার তুবড়ি ছাড়ে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কলকাতার মাঠে সব চাইতে ভাল প্লেয়ার কে? বলল—"জার্নেল সিং কলকাতাইলে নাল্লা কাশিক্কারোণ।" আন্দাজে বুঝলাম জার্নেল সিং কলকাতার বেষ্ট প্লেয়ার। খেলা এবং লেখাপড়া নিয়ে থাকলেও মুস্তাফার হবি ষ্ট্যাম্প জমানো। উৎসাহীরা একুশ নম্বর বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কোলকাতা বারো—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করলে সে খুশী হবে জানিয়েছে।

[৮ই জুলাই '৬৫

———

সঞ্জীব বসু

সন্ধ্যে উৎরে রাত হ'ল। আকাশ বাণীর খবর শেষ। এখনও তো কেউ বাড়ি ফিরল না। কি করে খবরটা পাওয়া যায়? সাতটা পঞ্চাশের স্থানীয় সংবাদ শুরু হল। অতঃপর সমাপ্ত। শিয়ালদহের ছকু খানসামা লেনের বাড়িতে মায়ের মুখে হাসি ফুটল এতক্ষণে। মেজ ছেলের খেলার দিনগুলোয় বিকেল পড়লেই মা বসে থাকেন এমনিভাবে। কলকাতায় হোক বা বাইরে হোক, খবরটা না পাওয়া অবধি মায়ের শান্তি নেই। দাদা, ছোটভাই এবং বোনেরাও ব্যতিব্যস্ত।

ছকু খানসামা লেনের ঐ বাড়ির মধ্যমণির নাম সঞ্জীব বসু। ইষ্টার্ণ রেলের "স্ট্রং" ষ্টপার।

১৯৪১-এ পূর্ব পাকিস্তানে বরিশালে জন্ম হলেও বাবা রাইমোহন বসুর সঙ্গে ১৯৪৮-এ সেই যে কলকাতায় এসেছিল তখন থেকেই কলকাতার বাসিন্দা। পড়াশুনা মির্জাপুরের মিত্র ইনস্‌টিটিউশনে এবং সিটি কলেজে। বিজ্ঞানের ছাত্র খেলাধূলায় একাগ্র চিত্ত হলেও বড় চাকরির স্বপ্ন নিয়ে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল উনিশ শো তেষট্টিতে। চাকরি নিয়ে রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ ও মধ্য প্রাচ্য ঘুরলেও এবং আরও প্রমোশনের সম্ভাবনা থাকলেও সঞ্জীব তার অ্যাম্বিশন খেলার নেশায় ফুৎকারে উড়িয়ে দিল গতবার। লীগ খেলবার জন্য তেহরাণে বসেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সটান কলকাতায় চলে আসে।

* * *

স্কুল এবং কলেজে পড়বার সময়ে সঞ্জীব ফুটবলের ক্যাপ্টেন হলেও ক্রিকেটও ভাল খেলে। একষট্টিতে রণজি ট্রফির ফাইন্যালে সিলেকসনেও তার নাম উঠেছিল।

ফুটবলে ফার্ষ্ট ডিভিশনে প্রথম দেখা যায় বাষট্টিতে উয়াড়ী ক্লাবে। তেষট্টি থেকে রাজস্থানে এবং এ বছর ইষ্টার্ণ রেলে।

ফুটবলের জন্য 'জীবন বিসর্জন' দিতে পারলেও সঞ্জীবের আশা অনেক। একবার আই. এ. এস হবে ভেবেছিল, অবশ্যি তখন বয়েস কিছুটা বেশি হওয়ায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি। সঞ্জীবের মতে, এই তাঁর প্রথম পরাজয়। তবুও সে হাল ছাড়েনি। মেরিন কলেজে পড়তে পড়তেই বি-এ পাশতো করেছেই, এখন আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। এখন সে পূর্ব রেলের ট্রাফিক অ্যাপ্রেন্টিস।

* * *

এবার কারা ভাল খেলবে—জিজ্ঞেস করায়, সঞ্জীব নিজের কোন কথা বলেনি, পি. কে-র (ব্যানার্জী) কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিল: উই আর দ্য বেষ্ট ফুটবল প্লেয়িং ক্লাব ইন ক্যালকাটা।

বল্লাম—ক্যাপ্টেনের কথা ঠিক থাকবে তো?

—খেলার মাঠে গিয়ে দেখলে বুঝবেন ইষ্টার্ণ রেলের ক্যাপ্টেনের কথার দাম আমরা রাখতে পারি কিনা।

১৫ই জুন, ১৯৬৫

প্রশান্ত সিংহ

অপর ক্লাবে নাম লিখিয়ে যিনি আবার ফিরে এসেছেন ইস্টবেঙ্গলে, তিনি কিন্তু সত্যি সত্যি দল পরিবর্তন মোটেই পছন্দ করেন না।

অবশ্য দু'বছর আগে ইষ্টার্ণ রেল ছেড়েছিলেন একেবারে অন্য

কারণে—চাকুরিগত মতান্তরের জন্য।" আর এই চাকরির জন্যেই আপিসের সঙ্গে ক্লাবও বদল করেছিলেন প্রশান্ত সিংহ। এখন তিনি চৌরঙ্গীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী।

* * *

বেলগাছিয়ার মনোহর একাডেমীর ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন আন্তঃ স্কুলে খেলবার সময়। উনিশ শো পঞ্চান্নয় স্কুল ফাইন্যালের পর সিটি কলেজেও ছিলেন সেরা ফুটবলার। ছাপ্পান্নয় কলেজ লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সিটি কলেজে। সাতান্ন সালে ইষ্টার্ণ রেল দলে। সেই থেকে আজও তিনি প্রথম ডিভিসনে রয়েছেন। কেবল রয়েছেন বললে ভুল হবে। কেননা ঐ বছরেই ইষ্টার্ণ রেল আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যালে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে, আটান্নয় হয় লীগ চ্যাম্পিয়ন। উপরন্ত উনিশশো ষাট থেকে ন্যাশনালে তো খেলছেনই এমন কি পর পর কয়েকবার বিদেশেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ লাভ করেছেন।

বাষট্টিতে জাকার্তায় এশিয়ান গেমস্-য়ে ভারত ফুটবলে যে স্বর্ণপদক লাভ করে, তাতে পি. সিন্হা অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে আজও গর্ববোধ করেন। তেষট্টিতে সিংহলে প্রাক অলিম্পিক, চৌষট্টিতে ইস্রাইলের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপে ও গত বছর কুয়ালালামপুরে মারর্ডেকার খেলায়ও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। সব চাইতে বড় কথা—কলকাতায় তাতাবেনিয়ার বিরুদ্ধে পি সিন্হার আগে আর কেউ গোল করতে পারেন নি।

পি. সিন্হা ব্যাক ও গোলে ছাড়া আর সব জায়গায় খেলতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে খেলেনও। অবশ্য এর মূলে নাকি বাঘা সোম। কেননা, "খেলা যদি কিছু শিখে থাকি—তা এই বাঘা সোমের জন্যেই।"

উনিশ শো তেষট্টিতে ইষ্টার্ণ রেল ছাড়ার পূর্বদিন পর্যন্ত নাকি

বাঘাবাবু তাঁকে হাতে কলমে ফুটবল শিখিয়েছেন। শেখার ব্যাপারে আর যে ব্যক্তির কাছে তিনি চিরঋণী, তিনি হলেন —ভারতীয় দলের কোচ পরলোকগত এস. রহিম।

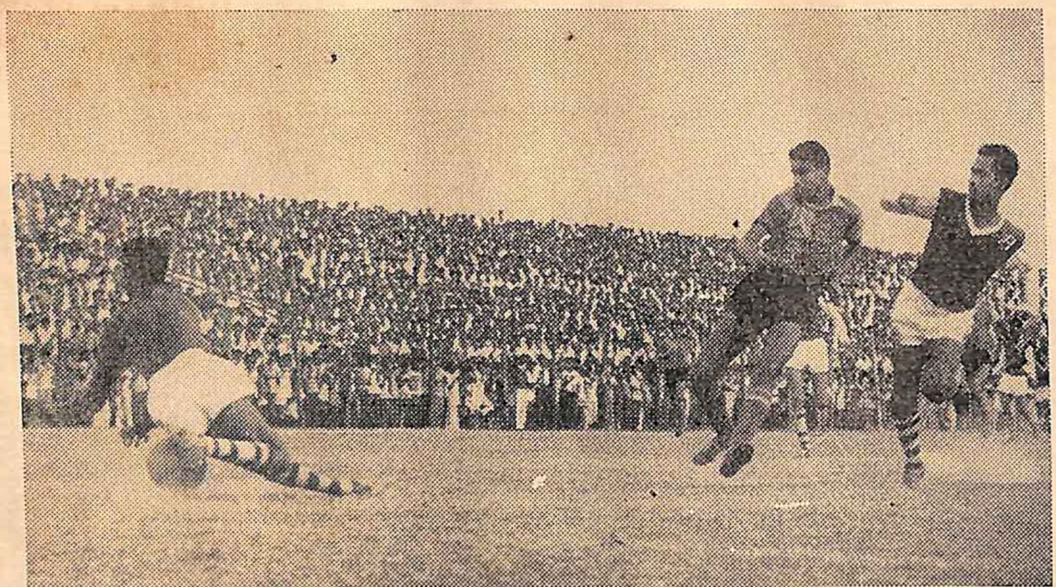
পি. সিন্‌হা এ পর্যন্ত দুটো অবিস্মরণীয় খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রথমটি এশিয়ান গেমস্‌-এর সেমিফাইন্যালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আর পরেরটি গতবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যালে।

চুণী, পি, কে এবং অরুণ ঘোষের খেলা ভাল লাগলেও তাঁর মতে কলকাতা ময়দানের আগামী দিনের উজ্জ্বল তারকা কাজল মুখার্জি আর পি. দে।

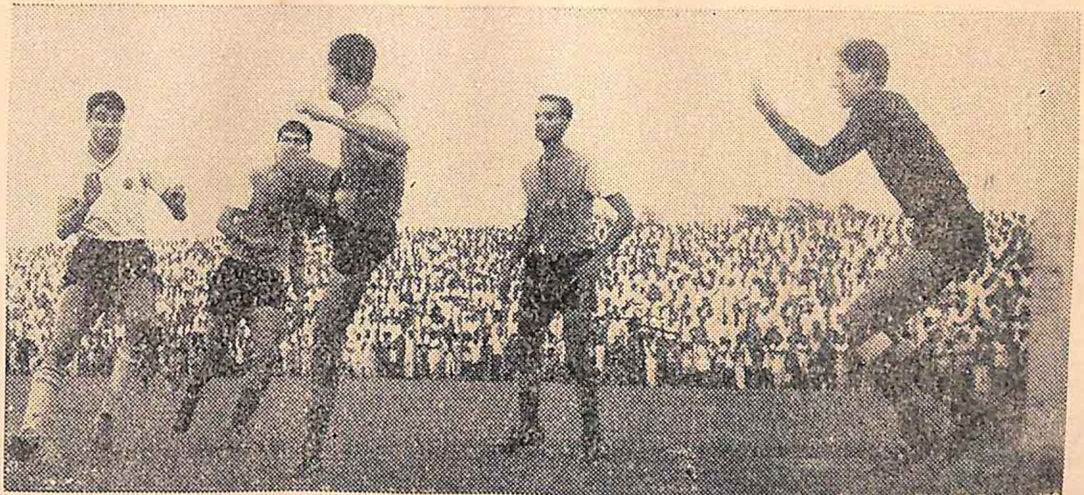
৬ই জুলাই, ১৯৬৫

পরিমল দে

গত বছর খেলা হচ্ছিল গৌহাটী ষ্টেডিয়ামে। ন্যাশনালের সেমিফাইন্যালে দুই দুর্ধর্ষ দলের সাক্ষাৎ। দুই দলই সমানে খেলে চলেছে—আপ অ্যান্‌ড ডাউন গেম। কেউ গোল দিতে পারছে না। রঙ্গভূমিতে দুটি দল আগন্তুক হলেও সাপোর্টারের অভাব নেই। কেবল শাড়ী নয়—যাঁরা মেঘলা পরে এসেছিলেন—তাঁরাও খেলার শেষ ভাগে হঠাৎ 'জংলা' 'জংলা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। দেখা গেল, জংলার শটে অন্ধ্রের গোলের জাল ছিঁড়ে বল বেরিয়ে গেছে। খেলা শেষ হতে তখন মাত্র সাড়ে তিন মিনিট বাকী। মাঠে বিজয়ী দলের প্লেয়ারদের মধ্যে এবং দর্শকদের মধ্যে যেমন



বাটা বনাম ইষ্টবেঙ্গল।   সারমাদ খাঁর তীব্র সটও ধরে ফেললেন বি. সাধু খাঁ।



উয়াড়ীর গোলের সামনে জটলা। ইষ্টবেঙ্গলের সাম্মাদ খাঁ ও উয়াড়ীর বলাই মুখার্জিকে দেখা যাচ্ছে।

উল্লাস তেমনি রেডিওর সামনেও। সেদিন ওই একমাত্র গোলে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে বাংলা বিজয়ী হয়।

এবার লীগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রথম খেলাতে ইস্টবেঙ্গল অনেক সুযোগ পেয়েও জিততে পারেনি। জংলা সবার ভাল খেলেও হোম ষ্টেটে নিজের দলকে জেতাতে পারেনি বটে, তবে গৌহাটীর চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা পেয়েছিল।

* * *

নামটা কি করে চাউল হল অঙ্গ-বঙ্গ? পরিমল (পি দে) কোন উত্তর দেয়নি। তবে ওই নামে সে অখুশী নয়। খেলা নিয়ে কথা—তা যে যাই বলুক—এমনি ভাব। অর্থাৎ নামে কি বা আসে যায়! পরিমল খেলেছে অনেক। খেলা শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়েছে। হেরেছেও। তবুও কদাচ মুখে বিষাদের ছায়া দেখিনি। কিন্তু মারডেকার মনোনয়ন লাভ না করাটা যেন তার খুব লেগেছিল। অন্ততঃ কথা শুনে তাই মনে হয়েছে। কণ্ঠে নিরাশা ও আশা মিশিয়ে বলল,—'নখদর্পনে' আমার সম্পর্কে বেরুলে নিশ্চয়ই কুয়ালালামপুর যেতে পারতাম। বেরোয়নি বলে বোমবাই ফেরত হলাম। এবার লিখুন—দেখবেন বিদেশ যাত্রায় জংলাও দলভুক্ত। (নখদর্পনের পাঁচ জন কুয়ালালামপুর গেছেন।)

* * *

আজ কলকাতার খেলার মাঠের অন্যতম দুঃসাহসী খেলোয়াড় হলেন পরিমল। ইস্টবেঙ্গলে ঢুকে প্রথম প্রথম ভীষণ ভয় পেত। এর আগে মোহনবাগানে পাওয়ার লীগ ছাড়াও বালী প্রতিভা এবং উয়াড়ীতে তিন বছর কাটিয়েছে, ন্যাশনালেও খেলেছে। তবুও ভয় হতো—দুর্ধর্ষ টীমের দুর্ধর্ষ প্লেয়ার বলরমের জায়গায় ঠিক মতন খেলতে পারবে কিনা! ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদের মত কি জানি না; তবে সমর্থকরা পরিমলের খেলায় সন্তুষ্ট। তার সাম্প্রতিকতম খেলাগুলো বিশেষ করে কয়েকদিন

আগে হরেন্দ্র মুখার্জি স্মৃতি শীল্ড খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আই, এফ, এ, একাদশের হয়ে পরিমলের খেলা ও একমাত্র গোলটি মনে রাখার মতন।

কেবল মাঠে বলই কনট্রোল করে না। স্টেট ট্রান্সপোর্টের পাইকপাড়া অফিসে পেট্রল সেকশনের ইনচার্জ। সুতরাং দায়িত্ব দুই জায়গাতেই। বিয়ে করলে আরেকটা দায়িত্ব বাড়তো। কিন্তু তার দেরী অনেক। কেননা সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে জংলার স্থান পঞ্চম। তাই মাস কাবারে মায়ের হাতে টাকা দিয়েই খালাস।

খড়দহের বাসিন্দা হলেও আসলে সে পূর্ববঙ্গের ছেলে। জন্মস্থান ঃ ফরিদপুর—তেইশ বছর আগে। ঊনষাট সনে শিবনাথ হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশের পর বঙ্গবাসী ও মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু খেলার চোটে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" আদর্শটি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

* * *

নামকরা খেলোয়াড় হয়েও পরিমল অতীত স্মৃতি ভোলেনি। রঞ্জু লাহিড়ীর মতো সেও সময় পেলে খড়দহের কুলীনপাড়া ক্লাবের খেলায় নেমে যায়। আজও কথায় কথায় বলে স্কুলের গেম টীচার সুরেন্দ্রনাথ শিকদারের কথা। তাছাড়া বাঘা সোম, ল্যাংচা মিত্র, অমল দত্ত ও ভেঙ্কটেশ তো আছেনই। এরা না থাকলে জংলাকে নাকি কেউ চিনত না।

* * *

ফুটবল ছাড়া পরিমল টেবল টেনিস ও ব্যাটমিণ্টন খেলে। অন্য কোন হবি নেই। তবে ইস্টবেঙ্গলে এসে তার একটা ইচ্ছা এখনও পূর্ণ হয়নি। এজন্য বন্ধুরাও কথা শোনায়। প্রতিবারেই

সে কথা রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। কি সে ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি—জিজ্ঞেস করেছিলাম দু তিন বারেও উত্তর পাইনি। অবশেষে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল,—ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মোহনবাগানের গোলে একটাও বল ঢোকাতে পারিনি।

ওর ইচ্ছা গত শনিবার পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম থাকায় পরিপূর্ণ হতে পারেনি ফাউলের বিধানে।

৩১শে আগষ্ট। ১৯৬৫

সি. প্রসাদ

একজন চুপ। আরেকজনের কণ্ঠে অট্টহাসি। দাবার ঘুঁটি গুলো পড়ে রয়েছে পাশে। বুঝলাম এক্ষুণিই শেষ হয়েছে খেলা। ঘোড়াতেই মন্ত্রীকে খেয়েছে। 'চুপ' ছেলেটি সুজাত। অট্টহাসির লোকটি অখ্যাত। কালীঘাটে ক্ষীরোদ ঘোষ মারকেটের ওপরতলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্যাম্পে দাবাখেলা নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু একই ঘরের পাশের খাটিয়ার চিত্র অন্য। সুঠামদেহী তরুণটি ওদিকে ভ্রূক্ষেপই করে না, খেলা জ্ঞান—খেলা ধ্যান। সেদিনও সে খালি পায়ে খাটিয়ার ওপর বসে আপন মনে ব্যানডেজ বাঁধছিল।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতেই হবে—প্রতিজ্ঞায় অটল হয়েই বোধহয় পাটনার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ সিং আজ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম ইমপরট্যাণ্ট প্লেয়ার এমাসে কুয়ালালামপুরে মার্ডেকা প্রতিযোগিতায় সে মনোনয়ন লাভ করলে তা খবর হিসাবে বিবেচিত হবে। তাঁর জন্য পাটনা থেকে কুড়ি মাইল দূরে নুরা গাঁয়ে স্ত্রী কুন্তী সিংহের দুশ্চিন্তা ও গর্বের সীমা নেই।

দেড় বছরের ছেলে সঞ্জয় কুমারও ঠাকুমার কোলে বসে রূপকথার রাজপুত্রের বদলে বাবার গল্প শোনে।

উনিশ শো চুয়াল্লিশের বর্ষশেষে পাটনার নুরা গ্রামে জন্ম। গাঁয়ের হংসদি মিড্‌ল স্কুলে পড়বার সময় থেকেই খেলায় নাম। এর মূলে ছিলেন দাদা রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং। একদা কলকাতার পুলিশ ক্লাব ও পাটনা ফুটবল ক্লাবের তিনি ছিলেন নামজাদা প্লেয়ার। দাদার কাছে হাতে কলমে ফুটবল শিখে অসংখ্য বার স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ষাট সনে নুরা হায়ারসেকেন্ডারী স্কুল থেকে বি-এন আর-এ। ছাই চাপা থাকলেও আগুন আগুনই। তাই পাটনার গ্রাম্য তরুণটিকে বি. এন. আর নিজেদের দলে আঁকড়ে রাখতে পারল না। এবার যে ইস্টবেঙ্গলে এবং শুরুতে যে স্টপারে খেলতেন আজও তেমনি ওই প্লেসেই খেলেছেন। শুধু খেলছেন বললে ভুল হবে। কেননা, সি প্রসাদ আজ ভারতের অন্যতম সেরা স্টপার। জার্নেলের পরেই তাঁর স্থান কলকাতার মাঠে। টোকিওতে ফুটবলে চন্দ্রশেখর ছিলেন ভারতের অধিনায়ক।

নেশা মেটাতে ফুটবল সিজনটা কলকাতায় কাটালেও তাঁর মন পড়ে থাকে 'দূর গাওমে।' কারণ, বৃদ্ধা মা, দাদা-বৌদি, স্ত্রী-পুত্র সবাই থাকে সেখানে।

অন্য কোন হবি নেই, সাঁতার কাটতে ভাল লাগে। সময় পেলে ভলিবল নিয়ে নেমে পড়েন। আর ইনডোর গেমস্? একেবারে চক্ষুশূল। সুতরাং একই ঘরে দাবায় কিস্তি মাৎ হলে গেলে, পাশায় কচেবারো পড়লে বা তাসে ফোর স্পেডের রি-ডাবল ডাক দিলেও সি, প্রসাদ নট নড়ন চড়ন থাকেন। বসে বসে বোধহয় ফুটবলের মার-প্যাঁচের কথাই চিন্তা করেন। মনে মনে বলেন—'অল বোগাস! সব ঝুট হ্যায়।'

এমন খেলা শিখলে কি করে।—জিজ্ঞেস করেছিলাম সি প্রসাদকে। বাংলা ইংরেজী ও হিন্দী মিশিয়ে উত্তরে বললে, নিজের চেষ্টা আর ভাল কোচিং পেলে স্ট্যানডারড প্লেয়ার হওয়া যায়। তবে টাকার লোভ কম থাকা উচিত।

প্রশ্ন—কলকাতায় ভাল কোচ আছেন?

উত্তর—নিশ্চই। শৈলেন মান্না, অমল দত্তকে প্রথম শ্রেণীর কোচ বলা যেতে পারে।

সি, প্রসাদের কথায় ও কাজে মিল যথেষ্ট। এবং এজন্যেই রোজ সকালে মাঠে তাঁকে প্র্যাকটিস করতে দেখা যায়।

[সি, প্রসাদ এখন মোহনবাগানের খেলোয়াড়]

৩রা আগস্ট। ১৯৬৫

দুলাল মণ্ডল

নারকের সুপুরি বাগান, সব্‌জি আর ধান ক্ষেত, আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঢাকী নদী—সবই মনে পড়ে! সকালে-বিকালে দুটো ষ্টীমারের পুঁ পুঁ আওয়াজ এবং তাই শুনে সময়ের আন্দাজ করা—আট বছর বয়সের কথা আবছা মনে পড়লে হঠাৎ অন্য-মনস্কতা আসে। তবে খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে ফেলে আসা গ্রাম কামিনী-বাসিতে ফিরে যেতে মনটা আর এতটুকু আনচান করে না।

চুয়ান্নয় সেই যে পাকিস্তান ছেড়েছিল তারপর আর একবারও ওমুখে তাকায়নি। ফুসরৎও ছিল না পৈতৃক ভিটের কথা ভাববার। পাকিস্তান ছেড়ে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারীর মতন আস্তানা নিতে হয়েছিল উদ্বাস্তু শিবিরে। এর মধ্যে মা বাবা আর এক ভাইকে চিরতরে হারিয়েও খুলনার নাম না জানা গাঁয়ের ছেলেটি নিজে হারিয়ে যায়নি। নিজের চেষ্টায় আজ সে কলকাতার মাঠ ময়দানের একটি প্রতিশ্রুতিবহ নাম। মোহনবাগান ফুটবল দুলালদের অন্যতম এই দুলাল মণ্ডল। চুয়ান্নয় আট বছর বয়সে পাকিস্তান ছেড়ে এসে দমদমের বাগজোলা উদ্বাস্তু শিবিরে দাদার সঙ্গে আশ্রয়

নিয়েছিল। খেলতো রবারের বল, পড়তো ক্যাম্পের স্কুলে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় বলে পাশের স্কুলে ভর্তি হল। বাষট্টিতে পাশ করল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। উল্লেখযোগ্য ঃ এর আগে উনষাটে খেলার পরীক্ষায় পাশ করে ইণ্টার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ফুটবলে ও কুমারটুলির হয়ে সেকেণ্ড ডিভিশনে খেলতে শুরু করে। একষট্টি থেকে তেষট্টি বেনেটোলায় এবং শেষ বছরে ওই দলের ক্যাপ্টেন হওয়াটাও স্মরণীয়। চৌষট্টিতে দুলাল প্রথম ডিভিশনে প্রথম খেলবার সুযোগ পায় হাওড়া ইউনিয়নে। এল পঁয়ষট্টি। দুলাল নাম লেখালো মোহনবাগানে। এদিকে ভাল খেলার কৃতিত্ব স্বরূপ ভারতের জুনিয়র দলের তালিকায় তার নাম উঠল। টোকিওতে গেল সপ্তম এশীয় যুব ফুটবলে খেলতে। এই তার প্রথম বিদেশ যাত্রা।

খেলতে খেলতে খেলুড়ে। দুলাল ফার্স্ট ডিভিশনে পৌঁছেছিল এমনি করে। তবে এর মধ্যে দমদম বেকার স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ট গোস্বামী ও দাদা কার্তিক মণ্ডলের উৎসাহ অনেকদূর এগিয়ে এনেছে। দুলাল আর দুজনের কাছে ঋণী। এদের প্রথম জন জীবনকুমার কুণ্ডু, তিনি প্রথম দুলালকে কলকাতার ময়দানে নিয়ে আসেন। আর দ্বিতীয়জন হাওড়া ইউনিয়নের কোচ ভেঙ্কটেশ। আধুনিক ফুটবলের কলাকৌশল তাঁর কাছেই দুলাল শেখে।

খেলা ছাড়া আর কোন এ্যাম্বিশন নেই। দশটা পাঁচটা সে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কর্মী। কাজ ও খেলার ফাঁকে রাত্রে বিদ্যাসাগর কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটির ছাত্র। দাদা থাকেন দমদমের প্রফুল্ল কলোনীতে—দুলালের স্থায়ী ঠিকানা ওটাই। তা হলেও ওখানে দুলালের হদিশ মিলবে না, কেন না, মোহনবাগানে এসে সে ওই ক্লাবের ক্যাম্পের বাসিন্দা হয়েছে এবং খেতেও হচ্ছে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণী খানা।

[দুলাল এখন ইস্টবেঙ্গলে খেলছে]

২২শে জুন ১৯৬৫

আপ্পালারাজু

"ভুল ছবি ছেপেছিস কেন ?"

একজন অচেনা, অজানা লোকের প্রথম পরিচয়েই ঐ কথা শুনে মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—ভদ্রতা জানেনা নাকি। পরে বুঝলাম, না। উনি কারেক্ট বাংলা বলতে পারেন বটে, কিন্তু ব্যাকরণ জ্ঞান নেই, এবং নেই বলেই কথাবার্তার শেষে আবার বলেছিলেন "আপনি ভুল লিখিস না যেন।"

কথা হচ্ছিল রোভার্স-বিজয়ী বি, এন, আর,-এর মধ্যমণি আপ্পালারাজুর সঙ্গে।

গার্ডেনরীচ রেল কলোনীর নতুন বাড়ির দেওয়াল ফুটো করে পেরেক ঝুলিয়ে রাখা বিজয়-মাল্যটি তখন শুকিয়ে গিয়েছে। অপ্পালাও বুঝিবা কিছুটা ক্লান্ত। তবে খেলার জন্যে নয়—বোম্বে থেকে আসার সময় বিভিন্ন স্টেশনে রিসেপশনের ধকল এবং গতকালের (১৮ই ফেব্রুয়ারী) আনন্দনাচের ফলে। মা, স্ত্রী এবং দাদাদের সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয়নি, তাই বোধ হয় মনও কেমন করছে।

ওয়াল্টেয়ারের ছেলে আপ্পালা। পুরো নাম কোস্তুরু আপ্পালারাজু। বাড়ির ছোট ছেলে, ভাই-বোনদের মধ্যেও কনিষ্ঠতম, তাই আদুরে এবং সবাই 'টমেটো' বলেই ডাকতেন। অবশ্য ওনামে তখন আর তিনি পরিচিত নন। এমন কি আজ আসল নামের মাথা আর ল্যাজ খসে গিয়ে আপ্পালায় এসে ঠেকেছে।

স্কুলে পড়ায় সময় থেকেই ফুটবল খেলা শুরু এবং মূলে বড়দা নারায়ণ রাও। "বড়দা না থাকলে ওলাইনে আসতেই পারতাম

না" বললেন আপ্পালারাজু। চুয়ান্ন সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে খেলোয়াড় জীবন সুরু করেছিলেন আপ্পালারাজু এবং আজ ছাব্বিশ বছর বয়সেও তা অব্যাহত। কেবল তাই নয় ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম সারিতে আজ এর স্থান। এ জন্যে মেওয়ালালের দান অনেকখানি।

ভাল প্লেয়ার হিসেবে ওয়াল্টেয়ারের সাউথ-ইষ্টার্ণ রেলের লোকো অফিসে চাকরি পেয়েছিলেন ছাপান্নয়। তারপর এল ঝড়, ছাই গেল উড়ে। সাতান্নয় আগুন বেরিয়ে পড়ল তার আসল রূপ নিয়ে। আপ্পালারাজু অন্ধ্রর হয়ে হায়দরাবাদে গেলেন প্রথম ন্যাশনাল খেলতে দুর্ধর্ষ বাংলার বিরুদ্ধে। সাতান্নর পর কয়েক বছর গ্যাপ গিয়েছে। ন্যাশনালে তিনি যান। কিন্তু ষাট থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবারই তিনি রেলদলের হয়ে ন্যাশনালে খেলছেন। রেল দলগুলোর তিনি বেষ্ট স্কোরার। সাতান্ন সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি গোল দিয়েছেন প্রায় শ' দুয়েক, হ্যাটট্রিকও করেছেন বহুবার।

প্রশ্ন—খেলার মাঠে কি গোল দিয়েই খুশী?

উত্তর—গোল দেওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য কিন্তু তা এমন হবে যেন নেট ফুটো করে বল বেরিয়ে যায়।

উনিশশো তেষট্টিতে ভারতীয় দলের হয়ে পেনাঙে ও ফিলিপাইনের বিরুদ্ধে ঠিক এমনি দুটো 'নেট ছেঁড়া' গোল দিয়ে দিলেন আপ্পালারাজু। ঐ সফরে বর্মা এবং থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও খেলেছিলেন।

গোলদাতা হিসেবে দেশেও তাঁর সুনাম অনেকের ওপরেই। উনষাট, ষাট এবং তেষট্টিতে কলকাতার মাঠে টপ স্কোরার ছিলেন। উনষাটে তার দেওয়া গোলের সংখ্যা ছিল চব্বিশ, ষাটে তেইশ, আর তেষট্টিতে সতের।

"উনিশশো তেষট্টিই আমার জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়।" ঐ বছর তিনি বি, এন, আরের ক্যাপ্টেন তো ছিলেন-ই এমনকি আই,

এফ, এ শীল্ডের সেমি ফাইনালে অন্ধ্র পুলিশের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকও করেন। আপ্পালুর মতে ঐটেই তাঁর জীবনের এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ খেলা।

—সাগর পারের কার খেলা আপনার ভাল লাগে ?

—আই লাইক পেলে অফ ব্রেজিল

—আর এদেশে ?

ইংরাজী আর বাংলায় কথা বলতে বলতে আপ্পালারাজু হঠাৎ মাতৃভাষা তেলেগুতে বলে উঠলেন—"বলরাম গাড়ি আটান্নু প্রেমেস্তানান্নু" অর্থাৎ বলরামের খেলা আমি ভালবাসি। উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে এ্যান্টনী, অশোক চ্যাটার্জী আর শেখ ফনী তাঁর কাছে প্রিয়। তাঁর মতে এরা একদিন উঁচুদরের প্লেয়ার হবেই।

—ভারতে এখন ভাল টীম কোন্‌টি ?

—হেসে উত্তর দিলেন, "এ্যাট প্রেজেণ্ট বি এন আর।"

ভবিষ্যতে টীম চেঞ্জ করারও তাঁর কোন ইচ্ছে নেই এবং এও জানালেন সর্বদাই তিনি এর বিরোধী।

আপ্পালারাজু এখনও সাউথ-ইষ্টার্ণের ওয়াল্টেয়ার অফিসে রয়েছেন। পোষ্ট— এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ওয়েলফেয়ার ইন্‌স্‌পেক্টর। গার্ডেন-রীচের সদর দপ্তরে নাকি চাকরির কথা উঠেছিল কয়েকবার। কিন্তু চার দাদা, এক বোন আর স্ত্রী—জয়া সর্বদাই বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। মা ডিটো দিয়ে বলেছিলেন—টমেটো বাড়িতেই থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে সব্বাই সমর্থন করেছিলেন বুড়ো মাকে। টপ স্কোরার কিন্তু এক্ষেত্রে স্কোর করতে পারেননি।

২০শে ফেব্রুয়ারী। ১৯৬৫

অশোক চ্যাটার্জী

প্রথম ডিভিসনে নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে মাত্তর এক বছরেই ভারত জোড়া নাম। দর্শকদের প্রিয় ও খেলোয়াড়দের কাছে প্রিয়তম অশোক চ্যাটার্জীর পিছনের ইতিহাস গৌরবের দিক দিয়ে কিছু কম নয়। স্কুলের ছাত্র জীবনে—পনের বছর বয়সে কলকাতার প্রথম ডিভিসনে (হাওড়া ইউনিয়ন) খেলবার সুযোগ খুব কমের ভাগ্যেই জুটেছে। আরও অতীতে চলে গেলে দেখা যাবে, আন্তঃস্কুল ফুটবলে অশোক হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের অধিনায়ক—অধিনায়ক আন্তঃজেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলারও, উনিশশো আটান্নয় পশ্চিমবঙ্গের হয়ে রাজধানী দিল্লিতে অল ইণ্ডিয়া স্কুল গেমস-এ খেলেছেন। রানার্স হলেও অশোক সেবার দিল্লির মাঠে পাঁচখানা মারাত্মক গোল দিয়েছেন। পরের বছর উনষাটে, ত্রিপুরায় আন্তঃজেলা ফুটবলে বাংলার হয়ে জোনাল ফাইন্যালেও খেলেন।

আটান্ন এবং উনষাটে—এই দু-বছর হাওড়া ইউনিয়নে খেলার পর ষাট সালে অশোক চলে আসেন মোহনবাগানে, তখন তিনি জুনিয়র টীমের হয়ে পাওয়ার লীগে খেলতেন, এক বছর না পেরোতেই প্রমোশন পেয়ে সিনিয়র টীমে এলেন। কেবল খেলায় নয়, লেখা-পড়ায়ও ঐ বছর তিনি এক ধাপ এগিয়ে যান। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ('৬১) হাজার হাজার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় অশোকের রোল নম্বরটাও উঠেছিল। আরও উল্লেখ-যোগ্য ঐ বছর রোভার্সে অংশ গ্রহণ ও ডুরাণ্ডের জন্য মনোয়ন লাভ। বাষট্টি-তেষট্টিতে লীগ, রোভার্স ও আই, এফ, এ শীল্ডে খেললেও তার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, তাই চৌষট্টিতেই অশোক মোহনবাগানের নিয়মিত খেলোয়াড়। গত বছর অধিকাংশ

খেলাতেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। লীগের তেইশটা ম্যাচে আর শীল্ডের সব খেলাতেই নেমেছিলেন।

অশোক প্রথম ন্যাশনালে (জুনিয়র) খেলেন উনিশশো বাষট্টিতে বার্নপুরে। অশুভ হলেও সেবার চারটে ম্যাচে গোল দিয়েছিলেন তেরটি এবং বাংলা চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। বাষট্টি ও তেষট্টিতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার ডাক এসেছিল। কিন্তু মোহনবাগানের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ঐ খেলাগুলোয় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, তবে এর মধ্যেই পেনাঙ এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঁচটি ম্যাচ খেলে আসেন। সেবার গোলও দিয়েছিলেন পাঁচটি।

এক বছরের নিয়মিত খেলোয়াড় জীবনে অশোক তিনটে 'জোর' খেলা খেলেছেন। প্রথমটা বাংলার হয়ে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গৌহাটিতে। খেলা শেষের মিনিট তিন-চার আগে চূড়ান্ত গোলটি দিয়েছিলেন। মনের মতন দ্বিতীয় খেলা ডুরাণ্ড ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আর সবশেষে তাতাবেনিয়ার সঙ্গে।

অশোক তাঁর ছোট্ট খেলুড়ে জীবনে কয়েকটা বিদেশী দলের সঙ্গে খেললেও অ-দেখা দল ব্রেজিলই তাঁর কাছে সব চাইতে ভাল এবং ভাল খেলোয়াড় হলেন—ব্রেজিলের পেলে, স্কটল্যাণ্ডের ডেনিস ল ইংল্যাণ্ডের জেসি গ্রিভস্, ববি চার্লটন আর স্পেনের দিস্তাফানো।

— দিশী ভাল টীম?

—বি এন আর এবং ইস্টবেঙ্গল।

—মোহনবাগান কি ভাল টীম নয়?

উত্তরে অশোক বললেন: নিজের দলের গুণগান করতে নেই। ওঁর মতে কলকাতা ময়দানে ভাল খেলোয়াড় রাজেন্দ্রমোহন ও সি প্রসাদ। এই একটি উত্তরেই বোঝা যায়, অশোক চ্যাটার্জী সত্যিকারের খেলোয়াড়।

বাবা মা থাকলেও আজ মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর দায়িত্ব অনেক। কেননা খেলার মাঠের জুনিয়র প্লেয়ার, বাড়িতে পাঁচ ভাই আর তিন বোনের মধ্যে সিনিয়র সেই। এজন্য তাঁকে রুজি রোজগারের কথাও চিন্তা করতে হয়। তাই বাষট্টির নভেম্বরে কলেজে পড়তে পড়তেই সেণ্ট্রাল এক্সাইজে চাকরি নিয়েছিলেন। দায়িত্ব দিন দিন বাড়ছে বলে গতবার ডিসেম্বরে এই কাজ ছেড়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ঢুকেছেন ভাল চাকরির আশায়।

ব্যাঙ্কে অংকের কাজ আর মোহনবাগানের হয়ে মাঠে নামলেও অশোক কিন্তু নিজের পাড়ার টীম কাসুন্দিয়া বালক সঙ্ঘকে বিস্মৃত হননি। হাওড়া জেলার দ্বিতীয় ডিভিশনে ঐ দলের পক্ষে প্রায় সব খেলাতেই তাঁকে আজও দেখা যায়।

—"ছোটবেলায় খেলার সাজ সরঞ্জাম ছুঁড়ে ফেলে দিলেও আজ কিন্তু বাবাই (শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়) আমার প্রথম সমর্থক, মা থাকলে তো এ অবধি পৌঁছুতেই পারতাম না।" গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ও এই প্রসঙ্গে আর দু-জনের নাম করলেন, প্রথম জন তাঁর মণ্টুদা (মণ্টু সরকার) উনিই অশোককে সর্বপ্রথম কলকাতার মাঠে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন মোহনবাগানের বলাই দাস চট্টোপাধ্যায়। মোহনবাগানে আসার মূলে ছিলেন ইনি।

ফুটবল খেলোয়াড় অশোক অন্য খেলাতেও কিছু কম যান না। —ব্যাডমিণ্টন খেলেন, ক্রিকেটও। কিন্তু ফুটবলের পর তাঁর নেশা ভলিতে। সঙ্গীতএ তাঁর নেশা বড্ড বেশী। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে। এখানেই শেষ নয়। অশোক কিন্তু এখনও ছাত্র। চাকরি আর খেলার ফাঁকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে তাঁকে ক্লাশ করতে যেতে হয়। আসছে বছরে ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী পরীক্ষার ফাইন্যাল দেবেন বলে খাওয়া ঘুম কমিয়ে দিয়েছেন। জানালেন ওঁর এক বন্ধু।

১৬ই মার্চ। ১৯৬৫

আক্রাম খান

মাত্র দশ বছর বয়সে আক্রাম স্কুল ছাড়ল। বাবা মাষ্টার টেলার। সকাল দুপুরে বাবার কাজ শেখা আর বিকেলে ফুটবল ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই সে জানতো না। ইতিমধ্যে দাদারা ভিন্ন হলেন। এবার আর শেখা নয়, রীতিমত বাবার কাজে সহায়তা। কিন্তু সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলতেই আক্রামের মন উড়ু উড়ু। ছেলের মন বাবা বুঝতেন। চারটে বাজলে আক্রামের ছুটি, কখনও আটকে রাখতেন না। আক্রাম ওখান থেকে সোজা খেলার মাঠে। ডায়মণ্ড ক্লাবের সেক্রেটারী শেখ রেজমান আলি কেবল মুখেই গোলকীপারের দায়িত্ব নয়, কোন্ বল কিভাবে ধরতে হবে, কখন পাশ করতে হবে সব শেখাতেন। ছোট ছোট টুরনামেণ্টে নেমে আক্রাম নামও করেছে। আক্রাম আলি বা আক্রাম বললেই সন্তোষপুর, বুঙ্গী, বাটা অঞ্চলের ফুটবল রসিকেরা মোহনপুরের (২৪ পরগণা) পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা এই ছেলেটিকে চিনতেন। ডায়মণ্ড ক্লাবের গোলকীপার বজবজ ইয়ং স্পোরটিং-য়ে গিয়ে আরও নাম করে। একষট্টিতে 'খেলার জন্য' বাটায় একটি চাকরিও পায়। কারখানার খাতায় নাম ছিল শেখ আক্রাম আলি। কিন্তু এক সাহেবের মর্জিতে নাম বদল হ'ল।

—"আজ থেকে তুমি আক্রাম খাঁ। এ তেষট্টির কথা। বাটা সেবার কলকাতা ফুটবল লীগে প্রথম ডিভিশনে খেলছে। আক্রাম অতঃপর এ খাঁ। কলকাতা ময়দানের অন্যতম উদীয়মান গোলকীপার।

কিন্তু প্রথম ডিভিশনে খেলায় এ খাঁ ঘাবড়ে গিয়েছিল।

খেলা পড়েছিল স্পোরটিং ইউনিয়নের সঙ্গে। স্পোরটিং ইউনিয়ন ১—০ গোলে বিজয়ী হয়।

আজ যে গোলকীপার পেনালটিকেও ভয় পায় না, সেদিন সে নিজের দোষেই গোলটি খেয়েছিল। তবে পরবর্তী কালে ('৬৪) তাকে গৌহাটিতে বরদলৈ ট্রফির সেমিফাইন্যালে জলন্ধরের কাছে ১—০ গোলে, পয়ষট্টিতে রোভারসের দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাকটরীর কাছে ২—১ গোলে ও গতবার আই এফ এ শীল্ডের তৃতীয় রাউনডে হায়দরাবাদের কাছে ২—০ গোলে বাটার হার উল্লেখযোগ্য তালিকাভুক্ত হলেও আক্রামকে দায়ী করা চলে না। অবশ্য বিপক্ষ দলগুলি এ বছর লীগে বাটাকে ৩৯টি গোল দিয়েছে।

বাটার জনৈক সমর্থক আমায় বললেন: "আক্রাম না থাকলে গোলের সংখ্যা হয়তো ডবল হত।" এ থাঁর বৈশিষ্ট্য—মহামেডানের বিরুদ্ধে খেলা স্বভাবতই ভাল হয়। চার বছরে লীগের আটটি খেলায় ওদের কাছে গোল খেয়েছে মাত্র তিনটি। তবে লীগের একটি খেলার কথা আক্রাম কিছুতেই ভুলতে পারে নি। "খেলার মাঠে আহত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, অনেকে অনেক রকমে মারেও।" থুতনি দেখিয়ে বলল, "আমার এ দাগ চিরকাল থাকবে, সঙ্গে সেখ আলীর নামও।" অবশ্য আক্রাম কোনদিন প্রতিশোধের কথা চিন্তা করেনি। বুট দিয়ে মারলেও ওর পরে শেখ আলীর সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে আক্রাম বন্ধুর মতই ব্যবহার করেছে। খেলোয়াড়ের আদর্শকে কদাচ ভুলে যায়নি। এ আদর্শ তার গৃহেও বিদ্যমান। তেষট্টিতে বাবার ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল আক্রামের রোজগারেই সংসার চলত। চৌষট্টিতে বাবা মারা যাওয়ার পর সেই মা ও ছোট ভাইয়ের সংসারে হেড অফ দ্য ফ্যামিলি। শেষের দিকে বাবা রোজগার না করলেও বাড়ির ভাবনা ছিল না। আক্রামের কাছে বাবা আজ স্মৃতি। ফেলে আসা দিনগুলি—বিশেষ করে ছোটবেলার টেলারিং

জীবনের কথা মনে পড়লে উনিশ বছরের এই ছেলের আঁখি ছল ছল করে। 'চারটে বাজে, খেলার সময় হয়েছে"—আক্রামের মনে হয় বাবা যেন আজও পাশে বসে ঐ কথা বলছেন। চৌষট্টিতে লীগের একটি খেলা দেখতে গিয়েছিলেন উনি। মহামেডান সেদিন বাটাকে গোল দিতে পারেনি। বাবা বাড়ি ফিরে মা-র কাছে ছেলের প্রশংসা করলেন, আক্রামকে বললেন— "তুই চেষ্টা করলে ইণ্ডিয়া টীমে খেলতে পারবি।" খেলার পর বাড়ি ফিরলে আজও বার বার ঐ কথা মনে পড়ে। বাবার মুখে প্রশংসা শুনে মা যে বুট কিনে দিয়েছিলেন—সেই বুট পরতে পরতে "নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি!"

—জিজ্ঞেস করলাম,—"কেন?"

—প্রায় তিন বছর হতে চলল বাবার আশা সফল করতে পারলাম না। তবে অখ্যাত গাঁয়ের ছেলেটি লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পরিশ্রমে কুণ্ঠিত নয়। আক্রাম তাই জিমনাসিয়ামের অভাবে বালতির হাতল গোল করে রিং বানিয়েছে, বাড়ির উঠানে বাঁশ পুঁতে ওখানেই রিং করে। খালি হাতে ব্যায়াম এবং আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার স্কিপিং তার দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে।

উল্লেখযোগ্য: এ খাঁ চুল ছোট করেছে অনেক আগে ('৬৩ তে) শুধু খেলোয়াড়দের দেখে নয়—বাবার বকুনিটাই ছিল মুখ্য কারণ।

২০শে সেপ্টেম্বর। ১৯৬৫

রঞ্জিত লাহিড়ী

ইতিহাস-প্রিয়, পরে এনজিনীয়ারিং, খেলে ফুটবল। সুতরাং খড়দহ থেকে রোজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাশ করবার পরও মাঠে ফিরে যদি সবার চেয়ে ভাল খেলে, তা হলে একে 'অদ্বিতীয়' বা শুধুমাত্র 'ব্যতিক্রম' আখ্যা দিলে ভুল হবে। কলকাতার খেলার মাঠের ইতিহাসে এ যেন একটা নজীর। কুড়ি বছরের এই ছেলেটি কথাবার্তায়ও অনন্য। কলিকালের ছেলে হয়েও আত্ম-প্রচারে বিমুখ।

নিজের কথা কিছুতেই বলতে চায় না রঞ্জিত লাহিড়ী। ফার্ষ্ট ডিভিশন প্লেয়ার হয়েছে, কিন্তু ছবির এ্যালবাম নেই। এখানে ওখানে খুঁজলে খেলার কোন ছবি পাওয়া যাবে না। খুব কষ্টে পরীক্ষার জন্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবির দু'একটা কপি মিলতে পারে।

'মাঠ ময়দানে'র কক্ষে বসে প্রশ্ন করেছিলাম: রঞ্জু, তুমি বড় ক্লাবে যাচ্ছোনা কেন?

একটু ভেবে বলল,—নিজেকে তৈরী করি। পরক্ষণেই অন্য উত্তর:—আগে আমার পড়াশুনা, তারপর খেলা; নইলে মা আস্ত রাখবেন না এবং দাদাও টাটানগর থেকে ছুটে আসবেন, ছাড়িয়ে দেবেন খেলার নেশা। তবে এখনও পর্যন্ত পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয়নি বলে ওঁরা খেলার জন্য উৎসাহ দেন সর্বদা। জীবদ্দশায় বাবাই ছিলেন প্রধান সমর্থক। বাবার বন্ধু মনীন্দ্রনাথ গুপ্ত এদিক দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

নারকেলডাঙ্গা হাইস্কুলে পড়ার সময়ও নিয়মিত খেলতো। ইন্টার স্কুল লীগ তো ছিলই। এমন কি উনষাট ষাট সনে ইস্টবেঙ্গল

জুনিয়র টীমে রেগুলার খেলেও বাষট্টিতে স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরুতে দেখা গেল রঞ্জু অঙ্ক ও মেকানিক্সে লেটার পেয়েছে। এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এনজিনীয়ারিং-এর চতুর্থবর্ষের সেরা ছাত্রদেরও অন্যতম। বন্ধু এবং অধ্যাপকদের ধারণা—সাতষট্টি সনে ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরুলে রঞ্জু আরও বিখ্যাত হবে।

জন্ম: রাজসাহীতে এবং বর্তমানে খড়দহের বাসিন্দা হলেও লেখাপড়া ও খেলাধূলার শুরু কলকাতায়। আগে খেলতো নারকেলডাঙ্গা সংঘে। স্কুল ছাড়ার পর একষট্টি থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে শ্রীনগর, বেনারস, গৌহাটি ও এলাহবাদ ঘুরে এসেছে। গত বছর উয়াড়ীতে ঢুকলেও খড়দহের কুলীন পাড়া ক্লাবের খেলাতে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। ক্রিকেট মাঠে রঞ্জু যেমন বল দিতে ওস্তাদ তেমনি ব্যাট চালাতেও এবং এজন্য চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি দু'সনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

রঞ্জিত লাহিড়ী সত্যিই ব্যতিক্রম। না হলে এতসব সাবজেক্ট থাকতে আগামী দিনের এন্‌জিনীয়ারের কাছে ইতিহাসের মোগল পিরিয়ডটা সব থেকে ভাল লাগে কেন। ভাবতেও বিস্ময় জাগে যে চুয়ান্ন কিলো ওজনের পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি দৈর্ঘের ছেলেটি বাড়িতে সুবোধ বালক বলে পরিচিত হলেও মাঠে গিয়ে দুরন্ত হয়ে ওঠে কি করে?

বোধহয় বন্ধুদের কথাই ঠিক—রঞ্জুর লাইফটা সেলফ কনট্রাডিকটরি।

২৪শে আগষ্ট। ১৯৬৫

কে. সাহা

গত মার্চের কথা। খড়্গপুরে টোকিওগামী জুনিয়র ইনডিয়া ফুটবল টীমের পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের ট্রায়াল শেষে একজন নতুন খেলোয়াড়ের নাম উঠল স্টপারের প্লেসে। বোম্বাইও গেল ফাইন্যাল সিলেকসনের জন্য। কিন্তু নাম বেরুল না খবরের কাগজে। মনে মনে দুঃখ পেয়েছিল সেদিন। কিন্তু হতাশায় ভেঙ্গে পড়েনি। ফেলইওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস্। বোমবাইয়ের অসাফল্য কলকাতায় সাফল্য বয়ে নিয়ে এল। ডাক এল বি. এন. আর থেকে। উয়াড়ীর কে. সাহা নাম লেখাল বি. এন. আরে। সেই থেকে ওই দলের ষ্ট্রং স্টপার। হয়তো আগামী দিনে ভারতীয় দলেরও।

জন্ম : বিয়াল্লিশের বিপ্লবে, তদুপরি ঢাকায়। সুতরাং তেইশ বছরের তরুণ খেলার মাঠে বিপ্লব ঘটাবে তাতে আশ্চর্য কি!

ছোটবেলায় পড়তো ঢাকার স্কুলে। তারপর ১৯৫০ সনে কলকাতায় বালিগঞ্জের জগবন্ধু ইনসটিটিউশনে। এখান থেকে ফুটবলে তালিম নিয়ে ইন্টার স্টেট স্কুল গেমসে খেলে সুনাম পায়। স্কুলের ক্যাপ্টেনও হয়। কলেজে ঢুকেও কে সাহা সেরা খেলোয়াড়। ৬০ সনে 'অসীম সোম' স্মৃতি পদক প্রাপ্তি এর প্রমাণ। গতবার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ক্যাপ্টেন হয়েছিল। ফার্ষ্ট ডিভিশনে খেলা সুরু করে '৬ -তে। প্রথমে ছিল গ্রীয়ারে এবং '৬৩ সনে উয়াড়ীতে বাঘা সোমের দৌলতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে গৌহাটী এলাহবাদ ও মাদ্রাজে খেলে নাম কেনে। কিন্তু বি. এন. আর-এ আসার আগে অবধি সে কে সাহা হয়নি। কল্যাণ সাহা নামেই পরিচিত ছিল। উল্লেখযোগ্য : বাড়িতে কল্যান নামটাও যেন অপরিচিত। গড়িয়াহাট মোড়ে সকাল সন্ধ্যার আড্ডাগুলোয়

অথবা বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বন্ধুরা যেমন একটু ঢোক গেলেন, তেমনি বৌদিরা, মা এবং বাবাও। যুক্তিটা দিয়েছিল ওর এক বন্ধু। বললেন 'কে' বা কল্যাণ না বলে বংশী বলে খুঁজবেন—এ তল্লাটের সবাই বলে দেবে।

*   *   *

প্র্যাকৃটিসের দিনে প্র্যাকৃটিস, খেলার দিনে খেলা এবং নিয়মিত বাবার ব্যবসায়ের তদারকি করা ছাড়াও সে ছাত্র (বি-কমের)। তবুও বংশী বাড়িতে অপ্রিয়। জ্যাঠামশায়, বাবা ও কাকা—বংশী ফুটবল খেলুক—এটা পছন্দ করেন না। কলকাতার বাইরে যাবার কথা উঠলে তো সমস্বরে বলে ওঠেন—'না-না'। অথচ কাকা নিতাইলাল সাহা একদা ঢাকার উয়াড়ীতে নামকরা ফুটবলার ছিলেন। আক্ষেপের কথাঃ আধুনিক বৌদিরাও ঠাকুরপোকে সাপোর্ট করেন না। তার খেলার দিনে রীলে হলে জেনে শুনেও রেডিও খুলতে ভুলে যান।

কিন্তু বংশী এতে মনখারাপ করেনা। তার ধারণা– ভাল খেললে ঘরে-বাইরে সবার প্রিয় হবে। বাড়িতেও সে খেলে। তবে ইনডোর গেম নয়। লাল, নীল ও সোনালী মাছগুলো তার খেলার সাথী। ওরাই বংশীর সংসার। ওদের মেজাজের সঙ্গে তার মেজাজ একই সূত্রে গাঁথা। সকালে অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে মাছগুলো যদি খুব ছোটাছুটি করে বিকেলে খেলার মাঠে সেও বল নিয়ে বিপক্ষ দলকে হতাশ করতে পারে।

সুখের কথাঃ বি এন. আরে এসে বংশী সব খেলাই ভাল খেলেছে এবং মাছগুলোও নাকি কদাচ অশনি সঙ্কেত করেনি।

১৭ই আগষ্ট। ১৯৬৮

চন্দন ব্যানার্জী

"বাঙাল হিসেবে ইস্টবেঙ্গলেই খেলুম, তবে ভাল চাক্‌রি বাক্‌রি পাইলে মোহনবাগানে যাইতেও রাজি।"

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে স্মিত হাস্যে কথাগুলো বলে ফেললেন চন্দন ব্যানার্জী। বললেন হয়তো খুব আক্ষেপ করে, কারণ উনিশো সাতান্নয় প্রথম ডিভিসনে ঢুকে আজ ন'বছরেও তিনি বেকার। এবং বেকার বলেই বোধ হয় দিদি-দাদারা প্রায়শই বলেন "ফুটবল তোরে খাইছে"।

আদি নিবাস বিক্রমপুর (ঢাকা) মহকুমার গ্রামে হলেও চন্দনের জন্ম চাঁদপুরে, উনিশ শো আটত্রিশ সালে। তারপর বিয়াল্লিশে বাবার সঙ্গে চন্দন ব্যানার্জী কলকাতায় আসেন এবং তখন থেকেই কলকাতার অধিবাসী।

দাদা-দিদিদের ইচ্ছে ছিল চন্দনও তাঁদের মতো ইঞ্জিনীয়ার, এ্যাডভোকেট বা অধ্যাপক হবে, এবং তাঁদের এই আশা ফলপ্রসূ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল কারণ বাহান্নয় সে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছিল। পঞ্চান্নয় আই. এসসি. তেও খারাপ হয়নি। বি. এসসি. পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। সুতরাং চন্দন আণ্ডার গ্রাজুয়েট রয়ে গেলেন। ফুটবলেও নাকি তিনি 'গ্রাজুয়েট' হননি। কারণ তাঁর মতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারলে এ লাইনে গ্রাজুয়েট হওয়া যায়।"

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবন স্কুলে পড়বার সময়ে তাঁর খেলা খুলেছিল। কিন্তু এত বেশি ঢ্যাঙ্গা ছিল যে আন্তঃস্কুলে খেলা সম্ভব হয়নি। কলেজে প্রবেশ করে আর তাঁকে রাখা যায়নি। চুয়ান্ন সালে কলেজ নক আউটে আশুতোষের হয়ে প্রথম খেললেন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে। চুয়ান্ন পেরিয়ে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন কেটে গেল।

চন্দনের সৌরভ এর মধ্যে কিছুটা ছড়িয়েছে। সাতান্নয় ডাক এল জর্জটেলিগ্রাফের এবং সেই থেকে ফার্স্ট ডিভিশনের প্লেয়ার। আটান্নয় ঢুকলেন মোহনবাগানে। "কিন্তু এক সিজ্‌নে মাত্তর চারটে খেলে দমে গেলাম। খেলা ছেড়েই দেবো মনে করলাম। বাবা বললেন—পরাজয় স্বীকার করবি কেন?"

উনষাটে ভাল খেলবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চন্দন ফিরে গেলেন জর্জটেলিগ্রাফে। একষট্টি-বাষট্টিতে ন্যাশনালে চান্স পেলেন। "কিন্তু ন্যাশনালে প্রথমে খেললাম উনিশো তেষট্টিতে মাদ্রাজে।"

এই বছরই তাঁর ডাক পড়ে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানে খেলবার। "মোহনবাগানে আবার ডাক পেয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম কিন্তু বাঙাল হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে গেলাম।"

ইস্টবেঙ্গলে ঢুকে চন্দন তেষট্টি চৌষট্টি দু' বছরেই ডুরাণ্ড-রোভার্সে খেলেছেন। গত বছরের শেষদিকে বাংলার হয়ে গৌহাটীতে ন্যাশনালে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ডিসেম্বরে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে তাতাবেনিয়ার বিরুদ্ধেও খেলেছেন।

এ দেশে চূণী গোস্বামীর খেলাই তাঁর সবচাইতে ভাল লাগে, তবে, একদিন অশোক চ্যাটার্জী, পি. দে আর অসীমও সেরা খেলোয়াড় হবেন বলে জানালেন তিনি। বিদেশী খেলোয়াড়দের কিছু কিছু খেলা দেখেছেন তিনি। কিন্তু পেশাদারী দেখার আকাঙ্খা রয়েছে প্রবল। প'ড়ে এবং গল্প শুনে বিদেশী খেলোয়াড়দের মধ্যে পুশকাস্‌ই তাঁর প্রিয়।

চন্দনের জীবনটা দুর্ঘটনাময় বলা যেতে পারে। কেন না, দেড় বছর বয়সে সে জলে ডুবে গিয়েছিল, পাম্প করে জল বের করা হয়েছিল পেট থেকে। চার বছরে পেয়ারা গাছ থেকে পড়েও নাকি বেশ কিছুদিন ভুগতে হয়েছিল। তেষট্টিতে খেলার মাঠে পা ভাঙ্গার ফলে তাঁকে ছ-মাস বাড়িতে থাকতে হয়। গত বছর দিল্লিতেও হাঁটু ভাঙ্গে।

লাইসেন্স ছাড়া স্কুটার চালাতে গিয়ে চন্দন চারবার দুর্ঘটনা ঘটান। কিন্তু কোনবারই পুলিশ তার নাগাল পায়নি। মাঠের বলের মত প্রতিবারই স্কুটার নিয়ে ফুল স্পীডে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ফুটবল প্রিয় অনেকের কাছে চন্দন আজ প্রিয় হলেও বাড়িতে কিন্তু তাঁর সমর্থকের অভাব রয়েছে। কারণ ভাইপো-ভাইঝিরা-ছাড়া "আর কেউ নাকি কুট্টি কাকুকে পছন্দ করে না।" তবে প্রার্থীরা ল্যান্সডাউন রোডে গেলে চন্দনকে দলে টানবার চেষ্টা করেন এবং আসন্ন কর্পোরেশন ইলেকশনে জনৈক প্রার্থী নাকি তাঁর উপর ভরসা করে রয়েছেন।

৯ই মার্চ। ১৯৬৬

নাঈম

ভিন্ রাজ্যের অনেক খেলোয়াড় আজ পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক বা এ রাজ্যের খেলোয়াড় বলে পরিচিত হলেও মূলতঃ তারা ভারতীয়ই। যে দলেই খেলুন না কেন এরা ভারতীয় ফুটবলেরই উৎকর্ষ বৃদ্ধি করছেন। হালফিলের ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম নায়ক অন্ধ্রের সৈয়দ নাঈম—পুরোনাম সৈয়দ নাঈমুদ্দীন। জার্ণেলের মত তিনিও একবার "ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার" হলেন। কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাব নাঈমকে এই সম্মানে ভূষিত করেন।

গতবছর ভেটারেন্স ক্লাবের এই নির্বাচন কলকাতার ফুটবল রসিক মহলে অনেক গুজব তুলেছিল। কেন তাকে শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের সম্মান দেওয়া হল? এই ছিল তাদের প্রশ্ন। জানি না, ভেটারেন্স ক্লাব কেন তাঁকে এই ভাবে সম্মানিত করলেন। খেলার মাঠে দর্শকের গ্যালারীতে বসে নানা রকম প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছিল।

তাই গিয়েছিলাম ভেটারেন্স ক্লাবের জনৈক কর্মকর্তার কাছে।

বললেন, নাঈমের অনেক গুণ আছে—যা কলকাতার খুব কম খেলোয়াড়ের মধ্যেই আছে। জানালেন, মাঠে নেমে তার মত ক'জন প্লেয়ারের বিনীত আচরণ চোখে পড়ে, রক্ষণ-ভাগের খেলোয়াড় হয়েও নাঈম কখনও ফাউল করেনা—এটাও বলার মতন কথা। আর রেফারীর সঙ্গে ঝগড়ার কথা তার কোষ্ঠীতেই লেখা নেই। আর খেলার বিচার দর্শকরাই করবেন। অবশ্য ভেটারেন্স ক্লাবের ভেটারেন প্লেয়াররা সে অবসর দেন নি।

খেলার মাঠে ও মাঠের বাইরে এই দুই নাঈম কিন্তু মোটেই পৃথক নয়। একের সঙ্গে অপরের ভীষণ মিল। উভয়ক্ষেত্রেই সদা হাস্যময়। খেলার মাঠে পরাজয়ে সে বিচলিত নয়। হারলেও হাসে, জিতলেও তাই। শান্ত, নম্র, বিনয়ী। আবার বল পায়ে পড়লেও অকারণে দাপাদাপি করে না। দেখে বল মারে, সটও মাপা। নিজের গোলের মুখে যখন দুই পক্ষের জটলা—হঠাৎ তখন কী করে বল দূরে পাঠিয়ে দেয় বিপক্ষের কুশলী খেলোয়াড়রা আজও তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই নাঈম সেরা ফুটবলার। জার্ণেল, অরুণ ঘোষের সঙ্গে ভারতীয় দলে স্টপার হিসেবে স্বভাবতই নাঈমের নাম ওঠে।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঃ দেহে প্রচণ্ড শক্তি থাকা সত্বেও নাঈম কখনও সেই শক্তি প্রয়োগ করেন নি। বহু খেলাতেই নাঈমের এই গুণ দেখেছি। ইস্টবেঙ্গলকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি একটু চেষ্টা করলেই পারতেন। হয়তো তাতে ফাউল হতো, কিংবা তার ঝাঁপিয়ে পড়ায় বিপক্ষদলের খেলোয়াড়েরা আঘাত পেতেন।

অন্ধ্রের খেলোয়াড় 'দেশে' থেকেও যেমন 'বিদেশে' এসেও এক্ষেত্রে তেমনি। অবশ্য এগুলোকে কেউ কেউ 'তার ভুলে ইস্টবেঙ্গল হারলো'—এমন অপবাদও দিয়েছেন। তবুও নাঈম অবিচল। তিনি যেন তেন প্রকারেণ টীমকে জেতাবার পক্ষপাতী

নন। 'অন্যায় করে জিতবো কেন'? এই তাঁর বক্তব্য। ভেটারেন্স ক্লাবের আরেকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য বলছিলেন—অন্তত: এজন্যই নাঈমকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান দেওয়া যায়। শুধু কলকাতায় কেন—সারা ভারতে এমন আর ক'জন আছেন, যাঁরা ফুটবলকে এইভাবে শান্ত ও সুস্থ পরিবেশের মধ্যে রাখতে চান?

নাঈম কলকাতায় এসেছেন ১৯৬৩-তে। এনেছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ঐ বছর পেনাঙে তিনি ছিলেন ভারতীয় যুব দলের অধিনায়ক।

তারও আগে কোচ রহিমের শিষ্য। আরও অতীতে গেলে দেখবো—বংশানুক্রমে ফুটবল তার ধমনীতে। বাবা সৈয়দ বসিরুদ্দীনের ফুটবলে খ্যাতি ছিল।

আগে খেলতেন ফরোয়ার্ডে। কিন্তু অন্ধ্রের ইসলামিক ওল্ডবয়েজ ক্লাব ও আর্সেনাল ক্লাব ছেড়ে যখন ১৯৬০-এ অন্ধ্র পুলিশে এল, তখন স্থানও পরিবর্তন করে।

প্রথম ভারতীয় দলে খেলেন ১৯৬১-তে সার্ভিসেস এর বিপক্ষে। পশ্চিমজার্মানীর স্টাট গার্টের বিরুদ্ধেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। আর পেনাঙের পর থেকে তিনি ভারতীয় দলের অবশ্য খেলোয়াড়।

জার্ণেলের মত তিনিও নৈশ ফুটবলের পক্ষপাতী। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জিততে হলে নব্বুই মিনিট খেলারও পক্ষে।

সমর কুমার

বড় চাকরির লোভে বড় দলে খেলবার ইচ্ছে আমার নেই।
—তাহলে কি কর্ণের মত নিস্ফলের, হতাশের দলে থাকতে চান?

—না। তাই বা কেন! আমি নিজের ক্লাবকেই বড় করে তুলতে চাই তাছাড়া আমরাও তো কয়েকবার বড় টীমগুলোকে হারিয়েছি। সুতরাং আমরাও যে কোনদিন লীগ চ্যাম্পিয়ান বা শীল্ড বিজয়ী হবো না কে বলতে পারে!

কলকাতার ফুটবল মাঠে যে কটি ছোট টীম আজও বড় টীম-গুলোর কাছে 'বিভীষিকা', তাদেরই অন্যতম—বালী প্রতিভার সেন্টার ফরওয়ার্ড সমর কুমার নিজের দল সম্পর্কে ঐ কথাগুলো বললেন।

বালী প্রতিভা যে ছোট টীম নয়, তার প্রমান ওঁরা দেখিয়েছেন গতবার কলিঙ্গ কাপ প্রতিযোগিতায় রাণার্স আপ হয়ে। কলকাতার অন্যতম সেরা দল ইষ্টার্ণ রেল ঐ প্রতিযোগিতায় এদের সঙ্গে তুই শূন্য গোলে পরাজয় বরণ করেছিল। হক কথা খেলা শেষের মিনিট পনের আগে সমর কুমারই দ্বিতীয় গোলখানা দিয়েছিলেন।

বালীর ছেলে সমর কুমার (সমরেন্দ্রনাথ কুমার) বালী প্রতিভায় খেলবেন এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু জন্মেছেন নয়াদিল্লিতে। ছোটবেলাতেই বাবা মার সঙ্গে বালী চলে আসেন।

লেখাপড়া ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি বালী ব্যারাকপুর জুনিয়র হাইস্কুলে এবং তারপর শান্তিরাম বিদ্যালয়ে। ঐ স্কুলের গেম টীচার শ্রীবেচারাম রায় চৌধুরী তার ফুটবলের প্রথম গুরু। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ল্যাংচা

মিত্র। মারুতি ব্যায়াম বিদ্যালয় (ক্লাব)ও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। উপরন্তু বালী প্রতিভার চিকু রায় ও শ্যামপদ গাঙ্গুলী তো আছেনই।

স্কুলে সমর কুমারের খেলায় নাম ডাক ছিল। হাওড়া জেলার হয়ে উনিশ শো সাতান্নয় আন্তঃ জেলা স্কুল লীগে খেলেছেন, ঐ বছর কাঁচরাপাড়ায় আই, এস, এম এ-তেও খেলেন। সাতান্ন সালটা তাঁর কাছে 'গৌরবময়'। ওই বছরের ভাল খেলাই তাঁকে পরবর্তী বছর আঠান্ন সালে বালী প্রতিভায় প্রবেশাধিকার দিয়েছিল। প্রথম ডিভিশনে তাঁর প্রথম ম্যাচ ইষ্টার্ণ রেলের সঙ্গে। কেবল কলকাতার ফুটবল মাঠে সব দলের বিপক্ষে নয় অ-বাঙালী বনাম বাঙালী দলের খেলায় তিনি নেমেছিলেন এবং হ্যাটট্রিক করেছিলেন। দুর্গাপুরে বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতি তহবিলের জন্য প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন। তবে খেলবার জন্যে তাঁর দূরযাত্রা কটক অবধি। উল্লেখযোগ্য গত বার ওই যাত্রায় কলিঙ্গ কাপ ফাইন্যালে মহঃ স্পোটিং-এর বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন।

প্রথম ডিভিসনে সাত বছরের খেলার ইতিহাসে ১৯৬২ সালে সমর কুমার পুরো সিজনটাই বালী প্রতিভার ক্যাপ্টেন ছিলেন। আজ পর্যন্ত ন্যাশনালে খেলেননি বটে, কিন্তু সিনিয়র টীমের ট্রায়ালে ছিলেন একবার।

এ পর্যন্ত যেমন খেলেছেন অনেক, তেমনি দেখেছেনও অসংখ্য। কিন্তু মনের মতন খেলেছেন দুটি এবং উভয় খেলাই হয়েছিল গতবার। প্রথমটি লীগে—পোর্ট কমিশনারের সঙ্গে। দু গোলে হারছিল বালী প্রতিভা। সেদিন শেষ মুহূর্তে সমর কুমার দু-দুখানা গোল দিয়ে নিশ্চিত পরাজয় থেকে অব্যাহতি পান। "আমার দ্বিতীয় বেষ্ট ম্যাচ উড়িষ্যার পুরোণ রাজধানী কটকে, কলিঙ্গ কাপে ইষ্টার্ণ রেলের বিরুদ্ধে।"

তাঁর মতে গতবার এদেশে সব চাইতে ভাল টীম ছিল মোহন

বাগান, কিন্তু এ বছরে অন্য টীমের পক্ষে ইস্টবেঙ্গলকে রোখা দায় হবে।

—আর বাইরের টীম ?

—রাশিয়াই সব চাইতে ভাল, তবে বিদেশী আর দেশী খেলোয়াড়দের মধ্যে কেবলমাত্র স্যার স্ট্যালনী ম্যাথিউজ আর অরুণ ঘোষের খেলা তিনি পছন্দ করেন।

খেলোয়াড় হলেও সমর কুমার একজন সংগঠক, এবং তা ঘরে ও বাইরে। আজ;বালী প্রতিভার সর্বঘটে তাঁর উপস্থিতি দেখা গেলেও জীবিকার জন্যে যে ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেশটির তিনি মালিক, সেখানেও কদাচ তাঁর অনুপস্থিতির কথা কেউ বলতে পারবেন না। পাঁচছেলের মধ্যে তাই বাবা নির্মলবাবু ও মা আশালতা দেবীর কাছে তৃতীয় ছেলেটি মধ্যমণি।

কলকাতার মাঠ ময়দানের ফুটবল রসিকদের কাছে ছাব্বিশ বছরের এই তরুণটি সমর কুমার বা এস কুমার নামে খ্যাত হলেও বাড়িতে 'বুড়ো' হয়েই রয়েছেন। রকেটের যুগে আজ উনিশশো পঁয়ষট্টিতেও শীতের গরম পানীয় ও গরমের শীতল পানীয় চা পর্যন্ত খান না।

২৩শে মার্চ, ১৯৬৫

সম্পতকুমার

নাঈমুদ্দীনের মত সম্পতকুমারও খেলোয়াড়ের জন্মরাজ্য মহীশূরের আরেক সম্পদ। সম্পদ মোহনবাগান, বাংলা তথা ভারতেরও।

এবছরের লীগে মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিংএর

প্রথম খেলা যাঁরা দেখেছিলেন—তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সম্পতকুমারই ছিলেন ইডেনের সেই ঐতিহাসিক ফুটবল শুরুর দিনে হীরো। চুনী, জার্নেল যেখানে পরাহত, সম্পতকুমার সেখানে বিজয়ী। শুধু একটি নয়—অন্যরা যখন নিষ্প্রভ, সম্পত সেখানে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। সেদিন দেখেছিলাম, দেখেছিলাম এবং বিস্মিত হয়েছিলাম এমনভাবে বল তোলা যায়?

বল ছিল মহামেডানের গোলের কাছে। ওদের দুজন সম্পতকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। বিদ্যুৎগতির সম্পত দেখলেন আর উপায় নেই, সম্ভাবনা নেই ঐ ব্যূহ ভেদের। আমরা সকলে নিশ্চিত ধরে নিয়েছি—এবার সম্পত পরাহত হবেই। কিন্তু না। সম্পত গোড়ালি দিয়ে এমনভাবে বল তুলে মহামেডানের দুজনকে কাটিয়ে নিয়ে গেল যে তা দেখার মতন, স্মরণ করার মতন। সম্পতের ঐ ক্রীড়াচাতুর্যকে সেদিন সকলে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করে ছিলেন। যেমন তার পায়ের কাজ, তেমনি অফুরন্ত দম। মহীশূরের সব খেলোয়াড় যেন সমান। ভাবতেও অবাক লাগে কী করে এ সম্ভব!

মহীশূরের এই খেলোয়াড় ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬-র মধ্যে নিজ রাজ্যে ৩০টি হ্যাট্‌ট্রিক করেছে। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬-তে মহীশূরের হয়ে সন্তোষট্রফি খেলেছে। '৬৫-তে টোকিওর যুব ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধি ছিল।

বাংলার চোখে পড়ে কুইলনে সন্তোষট্রফি খেলার সময়। খেলা ছিল মহীশূর বনাম বাংলা। তারপর থেকেই ওর কাছে প্রস্তাব যায়—বাংলায় আসার। সম্পতের অনেকদিনের অভিলাষ বাংলার কোন টীমে খেলার। অবশ্য মোহনবাগানই তার প্রিয় ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু ফুটবলের অ, আ, ক, খ না জেনে তো যাওয়া যায় না। সম্পত অন্যের খেলা দেখেছে—বাড়ি ফিরে বল নিয়ে মাঠে নেমে সেইভাবে অনুশীলন করেছে। এই রকমে কতজনকে যে দ্রোণাচার্য মেনেছে তার শেষ নেই।

বড় টীমে খেলার আগে কারুর কাছেই সে কোচিং নেয় নি, সুযোগও মেলেনি। একালের রাইট আউট আগে খেলত সেণ্টার ফরোয়ার্ডে। সকলের অনুরোধে এখন স্থান পরিবর্তন করেছে। কেননা, রাইট আউটের কোন প্লেয়ার ছিল না মহীশূরে, অবশ্য সম্পাতের এতে কোন অসুবিধে হয়নি। সম্পত অনন্য অন্য খেলাতেও। ফুটবল সিজনে যেমন ফুটবল, তেমনি হকির সময় হকি। সেখানে গোলকীপার। সম্পত এ্যাথ্‌লেটিকসেও পারদর্শী। ছাত্রাবস্থার অনেক প্রাইজ, আজও তার ঘরের শোভা।

এখানেই শেষ নয়। খেলার মাঠের এই দ্রুতগতির একুশ বছরের (জন্ম ১৯৪৬এর ১৬ই জুলাই) ছেলেটি ১৫০-এরও বেশি স্পীডে সর্টহ্যাণ্ডের নোট নিতে পারে। নির্ভুল টাইপ করে।

কলকাতায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সম্পত জানিয়েছিল : কলকাতা হল ফুটবলের পাদপীঠ। আমার এ্যাম্বিশন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা। তাই কলকাতায় এসেছি।

ফুটবল ছাড়া সম্পত এখন অন্য কিছু ভাবে না। এই-ই তার ধ্যান ও জ্ঞান।

পূঙ্গব কানন

ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন কলকাতার মোহনবাগানে খেলার। "এন্ন্‌ডাইয়া সিরিয়া ওয়েছিল হউরুংদু মোহনবাগান টিসিল আরডাওয়েনডুম ইয়েন্দ্রা।" এই তামিল শব্দগুলির বাংলা অর্থ ওপরের বাংলা লাইনটি।

বলেছিলেন একালের যশস্বী খেলোয়াড় পুঙ্গব কানন—মাঠ

ময়দানে যিনি পি. কানন নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালোর তথা মহীশূরের খেলোয়াড় আজ বাংলার প্রতিনিধি। ভারতীয় দলেরও অবশ্য খেলোয়াড় ভিন্‌দেশী আঠার বছরের এই তরুণ। শুধু মহীশূর বা বাংলায় নয়—সারা ভারতে সে অপ্রতিরোধ্য।

কাননের জবানীতেই তার কথা বলি : আমার জন্ম ১৯৪৮এর ১০ই জুলাই। অস্টিন টাউন স্কুলে পড়ার সময় মহামেডান স্পোর্টিংএর বাসা খাঁর হাতে ফুটবল শিখেছি। তিনিই আমার গুরু। বাঙ্গালোর হিরোজের মিঃ হ্যারীর কাছেও কৃতজ্ঞ। থার্ড ডিভিশনে খেলা শুরু ১৯৬৩তে। তখন স্কুলে পড়তুম। খেলতুম বাঙ্গালোর হিরোজ-এ। পরের বছর চলে গেলাম দ্বিতীয় ডিভিশনের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফটে। আমরা লীগ চ্যামপিয়ান হলুম। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ দুবার খেলি জুনিয়র ন্যাশনালে। শেষবার আমি ক্যাপ্টেন হই। পরের বছর এলাম বড়দের দলে। বাঙ্গালোরের ইলেকট্রনিক্‌সে খেললাম। সেবার মাদ্রাজ এ্যাসোসিয়েশন শীল্ডের খেলায় হায়দ্রাবাদ একাদশকে পাঁচ গোলে হারাই, আমি হ্যাট্‌ট্রিক করি। রোভার্সে ঐ বছরই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলি।

বলা বাহুল্য জারণেলকেও সেবার এই কালো ছেলেটি নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। কিন্তু ইলেকট্রনিক্‌স ১—০ গোলে মোহনবাগানের কাছে পরাজিত হয়। যতদূর শুনেছি কানন ঐ সময়ই মোহনবাগানের কর্মকর্তাদের নজরে আসে। তারপর যখন ডুরাণ্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যালে ইলেকট্রনিক্‌স মোহনবাগানের মুখোমুখী হল তখনও পুঙ্গব কাননের টীম আবার ১—০ গোলে পরাজিত হয়। ঐ খেলাতেও কাননের ক্রীড়াশৈলী সকলের হৃদয় জয় করেছিল। কানন ছিল দিনের সেরা খেলোয়াড়। আবার দেখা কুইলনে। বাংলা বনাম মহীশূরের খেলা। বাংলা ওদের কাছে প্রথম দিন যে ১—০ গোলে হেরেছিল সে গোলটি দিয়েছিল এই খেলোয়াড়।

দুই পায়েই সমান জোর। ইলেকট্রনিক্‌সের ছেলের পায়ে

বৈদ্যুতিক শক্তি রয়েছে। ত্রিশ গজ দূর থেকে শট মেরে তিনি গোলের নেট ছিঁড়ে দিতে পারেন। লীগের তুল্যমূল্য খেলার শেষ মুহূর্তে তার দেওয়া গোল মোহনবাগানের হিসেবের খাতায় কতবার যে পুরো পয়েন্ট এনে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পা নয় যেন বুলেট। তার চকিত শট অভিজ্ঞ গোলকীপার ধরতে পারলেও টাল সামলাতে পারেন না। বল ও গোলকীপার—দুই মিলে গোল হয়ে যায়। ভাবতেও অবাক লাগে মহীশূর এত খেলোয়াড়ের জন্ম দিল কী করে! লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ, সোমানা, সাত্তার, রমণ, দামোদরণ, বসির, বশিথ, বরাকুন্না, ভরদরাজ, পাপ্পানা, পুষ্পরাজ, সন্মুগম, কানাইয়ান, আমেদ, এ্যাণ্টনী, ভেঙ্কটেশ, ধনরাজ প্রমুখের কত নাম!

মহীশূরের সাম্প্রতিকতম অবদান পুঙ্গব কানন। ক্রুকাট চুল, ছোট ছোট চোখ, স্মার্ট ছেলেটি আপন মহিমায় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম নায়ক।

প্রণব গাঙ্গুলী

কেউ বলে ফুটবলার। কেউ বলে—না, ছেলেটি ক্রিকেট আরও ভাল খেলে এবং আজই ওর ফুটবল ছাড়া উচিত। একে এক্‌সেপ্‌শনাল বলব না, না অভূতপূর্বও। তবে শান্তিনিকেতনের পড়ুয়া যদি কখনও কলকাতার মাঠকে 'সব হতে আপন' করে নেয় তাহলে হতে হবে বৈকি। আশ্চর্যের কথা ভাল খেলেও ছেলেটি কখনও হামবড়া ভাব দেখায় না, বড় ক্লাবে যাবার জন্য নিজের ক্লাবের সঙ্গে দর কষাকষিও করে না। অনেকের বিশ্বাস এই জন্যই

প্রণবকুমার গাঙ্গুলী আজও 'বাব্লু' হয়ে হাওড়া ইউনিয়নে পড়ে আছে।

* * *

হাওড়া চাটুজ্জে হাটের ছেলে হলেও পঞ্চান্ন সনে ন বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়েছিল। থাকত 'নেপাল কুটিরে'। পড়াশুনা, গানবাজনা ও হৈ হুল্লোড়ের চেয়ে প্রণবের মন খেলার মাঠের দিকে যেন একটু বেশি ঘোরাফেরা করত। সেই থেকেই ফুটবল ও ক্রিকেটে নাম। ব্যাডমিন্টনে তো একবার নিজের স্কুল চ্যামপিয়ান বানালো। এ ছাড়া টেবল টেনিস, বাস্কেট বল সবই প্রণবময় ছিল আটান্ন অবধি। অতঃপর শান্তিনিকেতন ছেড়ে প্রণব ফিরে এল। হাওড়া দীনবন্ধু হাইস্কুলে (মেন) লেফট আউট ইণ্টার ডিসট্রিকটেও সুযোগ পেল। বাষট্টিতে বেঙ্গল স্কুলের হয়ে ইম্ফলে গিয়ে প্রণব শুধু টপ্ স্কোরার নয়, বেঙ্গল স্কুল এই সর্বপ্রথম চ্যামপিয়ন হলো। উল্লেখযোগ্য ঃ ওর আগের বছর থেকে সে ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়র টীমে খেলা শুরু করেছে। একট্টি-বাষট্টি ওখানে কাটল। তেষট্টিতে মণ্টু সরকার ও গুনেন কর প্রণবকে নিয়ে এলেন হাওড়া ইউনিয়নে। চৌষট্টিতে জুনিয়র বেঙ্গল টীমের সঙ্গে আজমীড় যাওয়া প্রণবের কাছে গৌরবের।

"ক্রিকেটে প্রণব আরও উজ্জ্বল।" ক্রিকেট সেক্রেটারী পি এন পাণ্ডের অভিমত ওই। কেননা, বল, ব্যাট, ফিলডিং—তিনটেতেই সে সমান। সি এ বি-র সেকেন্ড ডিভিশন লীগে এবার চৌত্রিশটা উইকেট নিয়েছে। হাওড়া ইউনিয়নের সেকেন্ড ডিভিশন চ্যামপিয়নের জন্য প্রণবের কথা তাই কেউ ভোলে না।

* * *

সে কলকাতা ময়দানের সিজিন্ড প্লেয়ার নয়। ফুটবল ও ক্রিকেট মিলিয়ে সারা বছর আসতে হয় মাঠে, ঠিক যেমনটি যেতে হয় রোজ ভোরে উঠে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীতে জীবিকার

জন্য। সুতরাং সকাল দুপুর বা রাত নটার আগে ৬৭-২৪৫৩ নম্বরে ডায়াল করলে যেমন নেগেটিভ উত্তর আসবে, তেমনি না জেনে শিবপুর চাটুজ্জে হাটের বাড়ীতে খুঁজতে গেলে দারোয়ান বলবে— "বাব্‌লুবাবু আভি নেহি হ্যায়।"

এ সত্ত্বেও প্রণব ক্লান্ত নয়। ছেলেবেলার অগ্রদূত বা শরৎ সন্ধানী ক্লাবের খেলাতেও দেখা যায়। এর পরেও রয়েছে নিয়মিত গল্পের বই পড়া ও ফটোগ্রাফিতে হাত পাকানো।—

২৯শে সেপ্টেম্বর। ১৯৬৫

[প্রণব এ-বছর মোহন বাগানে খেলছে।]

বিমান লাহিড়ী

"বয়েজ, এই বল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো আজ আমরা হারব না।" বল এগিয়ে ধরলেন—সুখেন কুণ্ডু। এরিয়ানসের দশজন খেলোয়াড় বল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা নিলেন। তারপর মাঠে নামলেন এবং সত্তর মিনিট পর ইস্টবেঙ্গলের কাছ থেকে একটি পয়েনট নিয়ে তাঁবুতে ফিরলেন। সেদিন তাদের এগারো জনই 'হিরো'। কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায় দুইদলের বাইশজনের মধ্যে অনায়াসেই চিহ্নিত করা গেল একজনকে—৮ নম্বর জার্সি পরা ধূসর রঙের ছোট্টখাট্ট ছেলেটিকে। তছনছ হয়ে গেল মোহনবাগানের ডিফেন্স। যদি না জারণেল বল ছেড়ে ওকে আড়াল করে দাঁড়াতেন গোলের মাত্র পাঁচ গজ দূরে তাহলে হয়তো গোলও দিত। না পারায় রাগে ক্ষোভে সে জারণেলের জার্সি টেনে ছিল। রেফারি ওর বিরুদ্ধে ফ্রি-কিক দিলেও

সংবাদ পত্রে পরদিন লেখা হয় "এক্ষেত্রে প্রথম অপরাধা জারণেলের বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দ্দেশ দেওয়া যেত।"

খেলার শেষে ছেলেটি জারণেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। পরদিন 'আনন্দবাজার' ছেলেটি সম্পর্কে লেখে 'চমৎকার পায়ের কাজ, অফুরন্ত দম এবং সমস্ত দলকে খেলাবার প্রচেষ্টাই তার মুখ্য ক্রীড়া-ভূমিকা।"

কলকাতার উদীয়মানদের মধ্যে কানন-হাবিব-এর সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে এখন উচ্চারণ করা যায় আর একটি নাম—বিমান লাহিড়ী। "মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-ডিফেন্স ভেঙ্গে ঢুকে যাওয়া খুব শক্ত নয়, নিজের উপর আমার এই আস্থা আছে, অথচ—গোল করতে পারছি না। শট নিতে গিয়েই মনে হচ্ছে—যদি গোল না হয়।" বলতে বলতে বিমানের মুখে যন্ত্রনাক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ অন্য কথায় টেনে আনলাম। কেননা, আমার মনে হল ব্যাপারটি মনস্তাত্বিক ; উপযুক্ত কোচের সযত্ন ও সস্নেহ তত্বাবধানে ওর গোল না দিতে পারার জড়তা কেটে যেতে পারে।

বাবা ছিলেন ষ্টেশন মাষ্টার। বদলির চাকরি। ফলে ১৯৪৬ সালে জন্মের পর থেকে বিমানকেও বহু ষ্টেশন ঘুরতে হয়েছে (আদি দেশ ফরিদপুরের রুকণী গ্রামে)। অবশেষে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করা। চৌষট্টিতে এ, জি বেঙ্গলে ননী চক্রবর্তীর সহায়তায় খেলার জন্যই চাকরি মেলে। কিন্তু খেলা শুরু মাত্র ফারস্ট ইয়ারে পড়ার সময়। একদিকে কলেজ, অন্যদিকে রাধারমন সাহার কাছ থেকে ফুটবলে তালিম নিয়ে বিমান ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের হয়ে চারবছর মুরশিদাবাদ প্রথম ডিভিসনেও নিয়মিত খেলেছে। এর মাঝে ইণ্টার ডিসট্রিক্ট কলেজের হয়ে হুইলার শীল্ড, হেরম্ব মৈত্র শীল্ডও খেলেছে। উল্লেখযোগ্য শেষেরটি। কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজের সঙ্গে খেলায় কৃষ্ণনাথ কলেজ ৬-২ গোলে পরাজিত হয়। চারুচন্দ্রের হয়ে অরুণ ঘোষ একাই চারটি গোল দেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের গোল

ছুটি দিয়েছিল বিমান। চৌষট্টিতে জুনিয়র বেঙ্গল ছাড়াও পঁয়ষট্টিতে জুনিয়র ইনডিয়া ট্রায়ালে ছিল। নির্বাচিত না হওয়ায় মন খারাপ হয়েছিল বটে। কিন্তু বিমান হাল ছাড়েনি। মোহনবাগানের সঙ্গে হেরেও না। "টীম স্পিরিট থাকলে সাফল্য আসবেই। গত বছর পাটনায় দিল্লি ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এজন্য আমরা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ভাল খেলি।" বিমান অলইনডিয়া অডিটেরও তাই বেষ্ট প্লেয়ার। এবং এ জি বেঙ্গল সব দলের সেরা

* * *

প্রত্যক্ষভাবে কলকাতার সঙ্গে ওর ফুটবলের সম্পর্ক তেষট্টিতে। প্রথমে হাওড়া ইউনিয়নে। পরে ('৬৪-৬৫') স্পোরটিং ইউনিয়নে এবং এবার রামদার অনুরোধে এরিয়ানে। তৎসত্ত্বেও বিমান কলকাতার ছেলে নয়। মুরশিদাবাদের ছেলে। বন্ধুর (মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী) ডাক গঙ্গার এপার থেকে ওপারের স্থায়ী বাসিন্দা। মাস তিনেক হল ভদ্রেশ্বরে (হুগলী) গিয়েছে। ফল হয়েছে উল্টো। মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্ল্যান' সব আজ বিমানের পিছু নিয়েছে। ওখানকার ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বা অন্যান্য খেলার অংশ না নিলে ছেলেদের মধ্যে হৈ হট্টগোল বেঁধে যায়। কলকাতার কাগজে তার খেলার প্রশংসা বেরোয় বলে বন্ধুরা বলেন, "তুই কি রিপোরটারদের ভদ্রেশ্বরের চাল দিস।" ভদ্রেশ্বরে অবশ্য চালের আকাল।

কথায় বলে এযুগে 'নো ম্যান ইজ ইনডিসপেনসেবল'। বিমানের বেলায় একথা বেঠিক। ক্রিকেট, হকি ভাল না খেললেও জোর করে তাকে মাঠে নামানো হয়। আর বাইরে খেলতে বা বেড়াতে গেলে বিমানকে চাই-ই। নাহলে অমনভাবে গানে-মাৎ করে রাখবে কে?

হালে বাড়িতেও কিছু কদর। "মোহনবাগান এরিয়ান' খেলার দিন মা মাঠে গেছলেন। খুব খুশি। বাবা ছিলেন ঘোর বিরোধী। খেলে যে কিছু হয় তিনি বিশ্বাস করতেন না। সম্প্রতি মত একটু পালটেছে। অবশ্য বিরোধিতার কারণও ছিল। বড়দা খেলতে গিয়ে

আঘাত পেয়েছিলেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যে অসুখ এবং……। বিমানের বন্ধু বললেন—সেই থেকে উনি খেলার বিরোধী।

বিমান নিজের চেষ্টায় খেলায় নাম কিনলেও মাতৃকুলের দান অনস্বীকার্য্য। মা শিবদাস ভাদুড়ী ও বিজয়দাস ভাদুড়ীর নাতনী। মামার বাড়িতেও খেলার প্রচলন ছিল। দাদারাও নিয়মিত খেলোয়াড়। বিমানের ধারনা—সে আরও ভাল খেলতে পারত। কাগজে বেশি নাম প্রচার হওয়ায় তা হচ্ছেনা। মাঠে নামলেই আমাকে গারর্ড করবে। বি এন আর-এর দিন কে সাহা তো দু'তিনজনকে বলেই ছিল, 'লাহিড়ী-লাহিড়ী' 'ওকে স্পট কর।'

বিমানের ডায়েরী থেকে তুলে দিচ্ছি দুটি অংশ,—"যখনই মাঠে নামি তখনই ভাবি যত বড় খেলোয়াড়ই হোক সর্বশক্তি দিয়ে তাকে পরাস্ত করবই।"

"আমাকে আরও অনুশীলন করতে হবে, বিশেষত শূটিং প্র্যাক্টিস বড় হবার জন্য চেষ্টা করতে হবে॥

[বিমান এখন মোহনবাগানে খেলছে]

১২ই জুলাই, ১৯৬৬

এল, সি, বসু

ওর পায়ের অবস্থা দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়, কাল ওর মাঠে নামা উচিত হবে না। কিন্তু নেমেছিল আসাম পুলিশের বিরুদ্ধে। ভাল খেলতে পারেনি। দু গোলে কটক কম্বাইণ্ড (এশিয়া এফ এ য়ে) হেরে গেল। তারপর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। যদিও 'আনন্দ-বাজার' ভবনের সামনের বাড়িতে ওরা এসে উঠেছিল।

এল সি বোস—শুনতে কেমন যেন লাগে। লক্ষ্মীচরণ বসুতেও অনেকগুলি অক্ষর, তার থেকে ফুচু বল্লেই আমরা ওকে ডাকি। সারা কটক এবং ওড়িশা ওকে এই নামেই ডাকে। পাঁচ পুরুষে এই বাঙ্গালী ছেলেটি উড়িশ্যার বাসিন্দা। চন্দননগর থেকে পূর্বপুরুষ এসেছিলেন কটকে। ওর মামার বাড়িও চন্দননগরে। ভেবেছিলাম বাংলা জানে না। দেখি আমাদের মতোই বাংলা বলে। বাড়িতে রেওয়াজ বাংলায় কথা বলা।

কালীচরণ বসুর দ্বিতীয় পুত্রের খেলা দেখতে এবার কলকাতার সেরা দুটি ক্লাবের কর্মকর্তারা হাওড়া ইউনিয়ন মাঠে এসেছিলেন। আমাদের থেকেও ওঁরা অনেক বেশি খবর রাখেন কোন্ রাজ্যে কে কেমন খেলছে। ১৯৬২—ডিসেম্বরের কথাই ধরা যাক। ডিফেন্স ফান্ডের জন্য প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে মোহনবাগান কটকে এল। এসেই শৈলেন মান্না জানালেন, ফুচু মোহনবাগানের হয়ে খেলবে। খেলা বলরাম, অরুণ ঘোষ পুষ্ট ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে ফুচু খেলতে নামল, গোল দিল এবং মোহনবাগান তাইতেই (১-০) জিতল। প্রসঙ্গত বলে রাখি জর্জটেলিগ্রাফের দুজন, চন্দন ব্যানার্জী কমল সরকারকে সেদিন মোহন বাগানে খেলতে দেখা গেছল।

ফুচুকে দেখতে কেমন? ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। হাওড়া ইউনিয়নের অসহায় রক্ষণভাগ সেদিন যেভাবে ওকে লাথির পর লাথি কষিয়ে দিল (তাছাড়া ওকে আটকাবার কোন উপায় ছিল না।) এবং তারপরের খেলাতেও যখন নেমেছিল, বুঝে নিতে পারেন ওর স্বাস্থ্যটি কেমন? দূর থেকে মনে হয় অসীম মৌলিক! কিন্তু অনেক স্মার্ট। হাওড়ার প্রণব গাঙ্গুলী ছাড়া আর কোন ফরওয়ার্ডকে ফুচুর সঙ্গে তুলনায় আনতে পারছিনা, বস্তুতঃ এই দুটি ছেলে যে ভারতীয় জারসি পরবেই তাতে আমি নির্দ্বিধ। গত বছর ভারতীয় যুবদলে ফুচুর স্থান না পাওয়াটা আমার কাছে এখনও বিস্ময় হয়ে আছে। কটকে জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশীপের

খেলায় (ডঃ-বি সি রায় ট্রফি) ওর তুল্য ফরোয়ারড কোন দলেই—ছিলনা। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ডবল .হ্যাটট্রিক (৭-১) মাদ্রাজের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক সমেত ৪ গোল (৫—০), অর্থাৎ দুটি খেলায় দশ গোল দেয়। ভারতীর ফুটবল নির্বাচক মণ্ডলীর কেউ কটকে যাননি। তাতে অবশ্য দল গঠনে কোন অসুবিধা তাঁদের হয়নি। আরাম কেদারায় শুয়েই তো দলগড়া যায়। তার জন্য আবার মাঠে যেতে হবে নাকি?

ফুচুর গোল দেওয়ার তালিকাটি না দিয়ে বরং আগে জানাই, ওর বয়স এখন ২১। কটকের ক্রাইস্ট কলেজে সকালে প্রি-ইউয়ের ছাত্র, দুপুরে চাকরী করে সরকারী অফিসে। লম্বা ৫´৮˝, ওজন ৬৮ কিলোগ্রাম। বাবা ও দাদা ফুটবল খেলতেন, কাজেই বাড়িতে খেলাধূলো 'ট্যাবু' নয়। কটকের গঙ্গামন্দিরে ওদের কয়েকখানা বাড়ি পরেই সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ি।

ফুচু কটকের প্রথম ডিভিসন লীগ ও অল ইণ্ডিয়া স্কুল টুরণামেন্টে প্রথম খেলে ১৯৬১-তে। বয়স তখন ১৬। সন্তোষ ট্রফি ও ডুরান্ড্ খেলে ১৭ বছরে। আই এফ এ শীল্ড ১৮ বছরে, অল ইণ্ডিয়া ইউনিভার্সিটি টুর্ণামেন্ট ১৯ বছরে এবং জুনিয়ার ন্যাশনাল কুড়ি বছর বয়সে। গত বছর কুইলনে ওড়িশার অধিনায়ক ছিল, এল সি বোস।

এবারে কয়েকটি প্রতিয়োগিতায় ওর গোলের হিসাব দেওয়া—যাক—ইনদোরে সর্বভারতীয় স্কুলের একটি খেলায় ২ গোল। সর্বভারতীয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি খেলায় ৬ গোল (গুজরাটের বিরুদ্ধে হ্যাট্‌ট্রিক) সন্তোষ ট্রফির ছয়টি খেলায় পাঁচ গোল। জুনিয়ার ন্যাশনালে তিনটি খেলায় ১০ গোল (অন্ধ্রের কাছে ০—১ গোলে হেরে যায়)। আই, এফ, এ শীল্ডে ছয়টি খেলায় ৫ গোল। ডুরান্ডে দুটি খেলায় ১ গোল।

কটক লীগে ফুচুর গোল দেওয়ার সংখ্যা কষতে খাতা পেনসিল নিয়ে বসতে হয়। ছয় বছর লীগ খেলেছে সে। মোট ১০২টি

ম্যাচে গোল দিয়েছে ১৭২টি। গড় প্রতি ম্যাচে ১.৬৮ গোল। ইংল্যাণ্ডের এফ এ লীগে—গোলের- রেকরড 'ডিসহি' ডীনের। ১৯২৯-এ ডীন ৬০টি গোল দেন। আর ফুচু ১৯৬৪ তে কটক লীগে ৬০টি গেল দেয় ২০টি ম্যাচে। '৬৫তে সংখ্যাটি ঐ রকমই হত যদি না ১১টি ম্যাচের পর লীগ বন্ধ হত। তখন ওর গোল ছিল ৩০টি।

লীগ বন্ধ হয় জুনিয়র ওড়িশা দলের ট্রেনিং এর জন্য। কলকাতায় এ ব্যাপার ভাবাই যায় না। কিন্তু ওড়িশার কর্মকর্তাদের কাজে ক্লাবের থেকেও রাজ্যের সম্মান বড়। সাড়ে তিনমাস সময় ওড়িশা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের খরচে ৩০টি ছেলে (পরে ২২টি) বরবটি স্টেডিয়ামে থাকে, খায়, শোয় একই ছাদের নীচে, তাদের কোচ অমল দত্তর সঙ্গে। কলেজের পারসেনটেজ ও অফিসের হাজিরার ভাবনা ভেবেছিল ওড়িশার ফুটবল কর্তারা, খেলোয়াড়রা ছিল নিশ্চিন্ত।

ফুচু প্রাণ ঢেলে ট্রেনিং নিয়েছিল তখন। অসীম মৌলিকের সঙ্গে এইখানেই ওর ভীষণ মিল—অসম্ভব পরিশ্রমী। গুরুর বাক্য বেদবাক্য।

"যা কিছু আমি শিখেছি সব অমল দত্তর কাছ থেকে। তার আগে ফুটবল কি ব্যাপার আমরা জানতুমই না। গোল করতুম ঠিকই কিন্তু ফুটবল খেলার গূঢ় ব্যাপারগুলি প্রথম স্যারই (অমল দত্ত) ওড়িশার ছেলেদের বোঝাতে থাকেন। যতটুকু বুঝেছি তাই দিয়েই খেলছি, তবে আরও বুঝতে চাই।"

অমল দত্তকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার এই ছাত্রটি সম্পর্কে কি মনে হয়?" হাসালেন, দেখলেনই তো খেলা। আপনিই বলুন না?" তারপর নিজেইবললেন, "ওড়িশা কিন্তু ফুটবলে এগোবে। ওদের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা অনুকরণযোগ্য। ফুচুর মত অনেক ছেলেই ওখানে আছে। ভাল মাটি রয়েছে, দরকার শুধু ওস্তাদ কারিগরের॥

[ফুচু এবার বি. এন. আর দলে এসেছে]

৩০শে আগষ্ট। ১৯৬৬

কি দেখলাম

ফুটবলের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে দেখেছি নায়কেরা প্রত্যেকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সুযোগ পেলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। ভারত রেকর্ড নয়, বিশ্ব রেকর্ডও করতে পারে। আর এদের কেউবা সাফল্যের শুরুতে, কেউবা মধ্যগগনে আবার কেউবা খ্যাতির শীর্ষে। তাহলেও ব্যক্তিগত জীবনে অধিকাংশের দিন কেটেছে দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে। বেশির ভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সুতরাং আর্থিক দুরবস্থার কথা বলাই বাহুল্য। ভাত ও ফ্যানের সঙ্গে একটু নুন বা শুধুমাত্র ডাল ভাত খেয়েও কেউ কেউ মাঠ থেকে বিজয় মাল্য পরে ঘরে ফিরেছে, অসাফল্যও এসেছে, তবুও তারা হাল ছাড়েনি। নতুন উদ্যমে আবার নেমেছে ফুটবলের মাঠে।

ক্রীড়াঙ্গনে অসাফল্যের চেয়ে দারিদ্রের সঙ্গে লড়তে গিয়ে এরা অধিক বিপর্যস্ত হয়েছে। অসীম মৌলিক এর জ্বলন্ত প্রমাণ। দারিদ্র্য মেটাবার জন্য খেলা ছেড়ে তাকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এখানে ওখানে। ফার্ষ্ট ডিভিশনে উঠেও মই কাঁধে মুছেছে হাওড়া স্টেশনের এমপ্লিফায়ার গুলো।

শাস্ত্রবাক্য বিফল হয়না। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। পাকিস্তান ছেড়ে ছিন্নমূল নর নারীর সঙ্গে চলে এসেছে দুলাল মণ্ডল। আস্তনা রিফিউজী ক্যাম্প। পাশেই মাঠ—ওখানেই রবারের বলে অনুশীলন। আর আজ? কাজল মুখার্জিকেও দিনরাত অর্থ চিন্তা করতে হয়েছে। টাকার জন্য খেলতে গিয়ে পড়াও ছাড়তে হয়েছে স্কুল লাইফে। ফুটবলের অন্যতম নায়ক পি, কে ব্যানার্জীর

অবস্থাও তাই। 'আনডার এজে'ই চাকুরীজীবি এবং লেখাপড়াও শিকেয়।

স্পোর্টসম্যানদের খেলা ধ্যান ও খেলা জ্ঞান হলেও দারিদ্র্য মুক্তির জন্য আমাদর দেশে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন। কারণ ভাল প্লেয়ার হয়েও অনেকে চাকরি পাননি। তাঁদের কথা ভেবে একালের অনেকে আশাহত। সরকার বা ক্রীড়াপর্ষৎও এ বিষয়ে এখনও কতটা তৎপর তা বলা মুস্কিল। না হলে মার্কিনী স্কলারশিপ পেয়েও ব্যারি ফোর্ডকে পাশপোর্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি প্রভৃতির জন্য নাজেহাল হতে হবে কেন!

ছেড়ে দিয়েছেন কস্মিনকালে তাদের কথা লেখা হবে কিনা? কলকাতার বাইরে খবরের কাগজের লোকেদের চোখ যেন পড়েই না!

ফুটবলের নাকয়কদের ওই সম্পর্কে ফরিয়াদের অন্ত নেই। বহু পরিবারে এখনো খেলাধূলো সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এম-এ. পাশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য যদি চাকরি পাওয়া হয়, তাহলে স্কুল ফাইন্যাল পাশ বা পাশ না করা ফুটবলার তার থেকেও সফল হতে পারে। ডিগ্রীধারী হলে কিছু একটা জুটবেই খেলাধূলোর লাইনটা অনিশ্চিত। ভাল খেলছে, ভাল টাকা পাচ্ছে হঠাৎ চোট লেগে পঙ্গু হয়ে গেল। তারপরই আবর্জনার মত তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। অল্প লেখাপড়ার জন্য চাকরি পাওয়াও ভার হল। এইসব অভিজ্ঞতা দেখে বা শুনে আজকের ছেলে মেয়েরা কোন ক্রমেই লেখাপড়ায় অবহেলা করতে চাইছে না। সেই সঙ্গে টাকার ব্যাপারেও খুব সতর্ক হয়ে উঠেছে।

কয়েকজনকে দেখেছি একটু বেশী মাত্রায়ই টাকার কথা ভাবছেন। তাদের অভিযোগ, ভাল খাওয়া, বিশ্রাম, পরিশ্রম ও উদ্বেগ থেকে রেহাই পাবার জন্য টাকার দরকার। হ্যাঁ, টাকার দরকার কার নয়! কিন্তু যারা বড় হতে চায়, তারা প্রথমেই টাকার

এতটা ব্যস্ত হয় না, যা কয়েকজনকে হতে দেখেছি। ভাল খেলা এবং আরো ভাল খেলা এটাই লক্ষ্যের প্রথমে থাকে। টাকা আপনিই আসে। অন্তত পেলে বা য়ুসেবিও বা ম্যাথুজদের জীবনে তাই দেখা গিয়েছে।

আরো দেখেছি প্রাকটীশের সুযোগের এবং ভাল কোচিং-এর অভাব। মাঠ নেই, জিমনেসিয়াম নেই—শুধু নেই আর নেই। এর মধ্য থেকেও খেলোয়াড় উঠে আসছে শুধু নিজেদের জোরে। ভাবলে শ্রদ্ধা হয়, ভয়ও করে। শুধু নিজেদের জোরে কতদূর এগোবে এরা। কলকাতার কথাই ধরা যাক। খেলার মাঠ ক্রমশই কমে আসছে। এগারজন খেলার মত ফুটবল মাঠ খাস কলকাতায়, ময়দানের গুটি-কয়েক বাদ দিলে দু তিনটির বেশী নেই। বাচ্চারা খেলতেই পায় না। গলি ঘুঁজিতে, পথের উপরেই তারা শিখছে ফুটবল-ক্রিকেট। কলকাতার ময়দানে যত খেলোয়াড় খেলছে হিসেব করলে দেখা যাবে ভিন্ন রাজ্যের আর মফঃস্বল বা শহরতলীর ছেলেদের সংখ্যাই বেশী।

যা দেখলাম, তার শেষে যে কথাটি বড় হয়ে উঠছে—রত্ন নিজে হবে। সম্ভাবনা চারিদিকে ছড়ানো, হতাশ হবার কিছু নেই।

খেলার মাঠে হাঙ্গামা

ফুটবল মাঠের হাঙ্গামা জনিত বিষফল এখন বিশ্বময় ছড়িয়েছে। এক শ্রেণীর দর্শকদের গুণ্ডামীর ফলে ফুটবল শিকেয় উঠছে। মাঠের হাঙ্গামা এখন "জাতীয় কলঙ্ক"। যেহেতু সামান্য সংখ্যক দর্শকরাই এ-জন্য দায়ী। কিন্তু এ সমস্যা তাচ্ছিল্যের নয়।

মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে এরা গাড়ি ভেঙ্গে চুরমার করে, বোতল

ছোঁড়ে, আক্রমণ করে রেফারিকে ; যারা পোগ্রাম বিক্রী করে তারাও রেহাই পায় না। ইংলণ্ডে ফুটবল মরশুম এখন শেষ হলেও সংশ্লিষ্টরা মাঠের এই বিশৃঙ্খলা নিয়ে ভীষণ ভাবিত-চিন্তিত—এখনই যদি এ নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে পরিণতি কি হবে? কে বলতে পারেন —এই হাঙ্গামা না মিটলে খেলা দেখা থেকে কত দর্শক দূরে সরে থাকবেন। মাঠে গুণ্ডামীর ফলে ম্যাচ যাতে পণ্ড না হয়—সেইজন্য রুখে দাঁড়ানো, এই নিয়েও ভাবনার অন্ত নেই।

শুধু এই কথা বলে চুপ হয়ে থাকলে চলবে না যে, এই হাঙ্গামা বর্তমানকালে বিভিন্ন ঘটনাবলীর অংশমাত্র। কতকগুলো সতর্কবাণী বা দুষ্কৃতকারীদের সামান্য জরিমানা করলেও সমস্যা মিটবে না। জরিমানা সামান্য হলেও ওরা আরও মারমুখী হয়ে উঠবে, আর সতর্ক বাণী লেখা বিজ্ঞপ্তিগুলির দিকে তো নজরই দেবে না।

ল্যাংকাশায়ারের তিনজন খেলোয়াড় অভিযোগ করেছেন— বোতল ও ইট পাটকেল ছুঁড়িয়েরা খবরের কাগজের দ্বারা উৎসাহিত হয়। এরা বলেছেন, সংবাদ পত্রের মারফৎ হাঙ্গামাকারী-দের লোকচক্ষে ধরা উচিত নয়।

ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড-এর ভেনিস ল অভিযোগ করেছেন, খবরের কাগজগুলো মাঠের হাঙ্গামা নিয়ে অকারণে বাড়াবাড়ি করে।

ওখানকার পেশাদারী ফুটবলার অ্যাসোসিয়েসনের চেয়ারম্যান নোয়েল ক্যানট্ওয়েল হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করে ওয়েস্ট হ্যামের খেলা সম্পর্কে বলেছেন, মাঠের মধ্যে বড় কোন ফাউল না হওয়া সত্ত্বেও দর্শকরা হাঙ্গামা বাঁধাতে দ্বিধা বোধ করেনি।

*   *   *

ফুটবল এমনই খেলা যে দর্শকদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের যোগাযোগ প্রায় অভিন্ন। দর্শকাসনে বসেও ভাবেন যেন তাঁরাও এক একজন খেলোয়াড়। স্বভাবতই খেলার গতির সঙ্গে দর্শকরাও প্রভাবিত হন।

সামান্য কারণে তাই উত্তেজনাও দেখা দেয়। আবার কোন খেলোয়াড় যদি তাদের 'হিরো' হয়ে থাকেন।

এফ এ কাপ জয়ী টটেনহাম হটস পারের ক্যাপ্‌টেন ডেভ ম্যাচে ও নাটিংহাম ফরেসট এর ক্যাপটেন টেরি হেমেসি এ ব্যাপারে ফুটবলারদের দায়িত্বের কথা বলেছেন। "খেলোয়াড়দের রেফারীর সিদ্ধান্ত মানতে হবে। অবশ্য রেফারী যে সর্বদাই নিখুঁত সিদ্ধান্ত নেন তা নয়; বিশেষ করে প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে শাস্তি দিলে অসন্তোষ বৃদ্ধিই পায়।" হেনেসি এ সম্পর্কে খেলোয়াড় ও রেফারীদের মধ্যে আরও বেশি সহযোগিতা আশা করেছেন। আমরা একত্রে বসে এই সমস্যা আলোচনা করব।

ক্যান্টওয়েল খেলোয়াড়দের হয়ে বলেছেন, দর্শকদের হামালায় আমরা বিরক্ত। বিশেষত ওরা যখন একটি দলের তথাকথিত সমর্থক সেজে বসেন। খেলোয়াড় দের এ সমস্যা নিয়ে পুলিশ ও ক্লাবগুলোই চিন্তা করবে।"

তবে ক্যান্টওয়েলের অভিমত অনুযায়ী খেলোয়াড়দের ভূমিকা অনস্বীকার্য নয়। বিশ্বকাপের খেলোয়াড় জর্জকোহেন বলেছেন, একজন খেলোয়াড় দর্শকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। খেলোয়াড়দের আবেদনে দর্শকরা নিরস্ত হন। ফলে হাঙ্গামাও কমবে। হেনেসি নটিংহ্যাম ফরেসট দলের একটি খেলা প্রসঙ্গে বলেছেন, "দর্শকরা মাঠে অশ্লীল গালগালাজ করছিল, আমি ছুটে গেলাম থামাবার জন্য, ওরাও চুপ হয়ে গেল। আমাদের তখনকার দর্শকরা খুব ভাল।"

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন চরিত্রের দর্শক দেখা যায়। কেউ অতিমাত্রায় কোন একটি নির্দিষ্ট দলের গোঁড়া সমর্থক হন, কেউবা অন্য ধরণের। আনন্দে কেউ যখন আত্মহারা হন, অন্যরা ক্ষোভে তখন ফেটে পড়েন। এই জয় বেশির ভাগ সময় অঘটন ঘটায়। নিজের টীম জিতবে বলে যাঁরা মাঠে গিয়ে দেখেন তারা হেরেছে, হাঙ্গামার শুরু

তখনই। জয়ের বদলে পরাজিত হলে উত্তেজিত হয়ে পড়েন সমর্থকরা।

অন্য কারণেও উপরোক্ত দর্শকদের মেজাজ নির্ভর করে। নটিংহ্যাম ফরেসট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলেছে; কিন্তু কোন হাঙ্গামা হয়নি। তবে মিলওয়ালে অনুষ্ঠিত খেলাগুলোয় আগন্তুক দর্শকরা হাঙ্গামা করেছেন। ওরা এসেছিলেন ম্যানচেস্টার ও লিভারপুল থেকে। অর্থাৎ অভাব অনটন যেখানে, বা জীবনধারণ কষ্টদায়ক, কিংবা শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা, সেখানকার দর্শকরা একটু তিরীক্ষি মেজাজের।

আবার ল্যাংকাশয়ায়ের বাইরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-এর তথাকথিত সমর্থকরা দলের নাম ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও ওল্ড ট্রাফোরড ('হোম' এ) মাঠে বিপরীত ছবি দেখা যায়। গড়ে ওখানে ৫৩,০০০ দর্শক থাকলেও হাঙ্গামা হয় না বললেই চলে। দর্শকরা এখানে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। বলাবাহুল্য ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এখন ওদেশের মাঠে হাঙ্গামা-বন্ধে পথপ্রদর্শক।

ঐ ক্লাব ও পুলিশ একত্রে স্থানীয় ষ্ট্র্যাফোরড বুরো কাউনসিলের সহযোগিতায় বিশেষ আইন প্রণয়ন করছে।

ঐ আইনে হাঙ্গামাকারীদের কড়া সাজা দেওয়া হবে। কারণ এখন যে আইন আছে তা কিছুই নয়। ওদেশের ময়দানে ফ্ল্যাগ বা বা ব্যানার নিয়ে যাওয়া নিষেধ। ষ্ট্র্যাফোরড পুলিশের মতে দর্শক নিয়ন্ত্রণের এ হল প্রধান উপায়। "লাঠিসোঁটা দর্শকদের যথেষ্ট উত্তেজিত করে।" যেহেতু—ইতিপূর্বে ঐগুলি অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে, তাই ফ্ল্যাগ ও ব্যানার নিষিদ্ধ করণের পর ময়দানে কোন বড় হাঙ্গামা হয়নি।

জর্জ কোহেন মাঠে বোতল নিষিদ্ধকরণের অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, ভেতরে কোনরকম পানীয় বিক্রী করতে দেওয়া উচিত নয়। দর্শকরাও যেন বাইরের থেকে লেমনেড কিনে নিয়ে ভেতরে না

যান। লিভারপুলের খেলোয়াড়দের দাবি প্রকৃত হাঙ্গামাকারীদের ধরতেই হবে। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে ১৭ থেকে ২০ বছরের তরুণরাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী। অন্ততঃ ওয়েসট হ্যামের অনুসন্ধান রির্পোট তাই বলে। কোহেনও এজন্য এদের উপর নজর রাখতে বলেছেন।

মাঠে সামান্য হাঙ্গামায় অধিকাংশের খেলা দেখা পণ্ড হয়। এবার কোলকাতায় মোহনবাগান বনাম ইষ্টার্ণ রেলের খেলা নিয়ে যা হল তা আমাদের 'জাতীয় কলঙ্কের খাতায় আরেকটি সংযোজন। খেলায় জয় পরাজয়—থাকবেই। সব খেলায় জিততে হবে এমন—গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু ক্লাবের সম্পত্তি নষ্ট বা খেলোয়াড়কে প্রহার করলে কি জয় অবশ্যম্ভাবী হবে?

শান্তিপ্রিয় দর্শকরা কি বলেন? সামান্য সংখ্যকের উদ্দেশ্য (হাঙ্গামা) সকলের ওরা মদত দেবেন, না—অধিকাংশের আকাঙ্খা চরিতার্থ করবেন?

হাঙ্গামা বন্ধের উপায় ২

দুই দলে বাইশ জন খেলোয়াড় বয়স ষোল থেকে আঠার-র মধ্যে। সকলেই বিস্মিত হল খেলার শেষে। মেয়েরাও রেফারী হতে পারে এবং এত নিখুঁতভাবে খেলা পরিচালনা করতে জানে। পাতলা লম্বাটে চেহারার এই মহিলা রেফারী সেদিন বি-সি এ ফোরেন ও ফরচুনা দুই দলের ম্যাচটি এমনভাবে খেলিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকেই তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রত্যেক খেলোয়াড় অত্যন্ত সংযত ও ভয়ে ভয়ে খেলেছিল। অথচ

ব্রিজিট এমন রেফারিং করবে, তা খেলা শুরুর আগের মুহূর্তেও ছিল ওদের কল্পনাতীত উপহাসের বস্তু।

বয়স চব্বিশ। বাড়ি কোলনে। পুরোনাম ঃ ব্রিজিট ডাচম্যান। পশ্চিম জারমানীতে ফুটবলে যে কুড়িজন ডিপলোমাপ্রাপ্ত মহিলা রেফারী আছেন, ইনি তাদের অন্যতম। পশ্চিম জারমানীর ফুটবল রেফারিং-এ এতকাল পুরুষের যে একাধিপত্য ছিল এখন তার রীতিমত রেকরড ভঙ্গ হয়েছে। মেয়েরাও পুরুষের অধিকারে একচেটিয়া হস্তক্ষেপ করেছে। এক কথায় এটা ওদেশে খেলার মাঠে বিপ্লব।

ফুটবল রেফারিং-এ মেয়েদের অনুপ্রবেশ কয়েক বছর হলেও এখনও অনেক ফুটবল দর্শক (পুরুষ) বিষণ্ণ বদন নিয়ে খেলা দেখতে যান। মেয়েরা আবার কি রেফারিগিরি করবে! এমনি ভাব। কিন্তু ব্রিজিট প্রমাণ করেছেন "নহি কভু হীন"। হুইশল বাজিয়ে খেলা শুরুর পর দর্শকদের মনে একবারও এমন কথা উঁকি দেয় না —বাইশজন খেলোয়াড়কে পরিচালনা করছেন একজন মহিলা। কালো পোষাক পরা রেফারী যে, মেয়ে একথাও ভাবেন না। সম্ভবত ভাবতে পারেন না। কেননা, ব্রিজিট আজ পুরুষ রেফারীদের চাইতেও কোন অংশে কম নন। রেফারীর প্রতিটি আইন তাঁর নখদর্পণে এবং প্রয়োজনে প্রয়োগও করেন।

পনের বছর বয়স অবধি ব্রিজিট রীতিমত ফুটবল খেলেছেন। পাড়ার টীমে তিনি নিয়মিত খেলতেন। কিন্তু নিজে মেয়েদের ফুটবল খেলার বিরোধী। "আমাদের দৈহিক গঠন তন্ত্র (এ্যানাটমি) ফুটবলের উপযুক্ত নয়। তবে রেফারিং-এ আপত্তি কোথায়? রেফারিগিরি করায় নিশ্চই বাধা থাকতে পারে না।"

বিশেষজ্ঞদেরও জিজ্ঞাসা করলেন ব্রিজিট। 'না' বললেন না কেউ। সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন কোলনে। 'ডয়েৎনলানডফাসক' বেতার কেন্দ্রের স্পোরটস্ ডেস্কে চাকরি নিলেন। ওখানে ফুটবলের

ওপর কত রিপোরট লিখেছেন তার শেষ নেই। রেফারী হওয়ার বাসনায় আগে ফুটবল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য এই কাজ নিয়েছিলেন। তারপর একদিন জারমান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের রেফারী কোরসে নাম লেখালেন। কোরস শেষতো করলেনই, এমন কি পরীক্ষার ফলও বেশ ভাল হ'ল। এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

শুরুতে তাকে অস্থায়িভাবে রেফারিং করতে দেওয়া হত। পুরুষদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে সে দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ত। রেফারীর কাজ মেয়েদের নয়—একথা প্রচলিত থাকলেও ব্রিজিট-এর হুইশলে যেন অনেক পুরুষকেও হার মানাত। তাছাড়া বড় কেউ আসতে চান না। ভিড়—কম। তাই ক্রমশঃ ম্যাচ খেলানোয় ডাকও বেড়ে গেল ব্রিজিটের।

এ পর্যন্ত তিনি পঞ্চাশটি ম্যাচ খেলিয়েছেন। কিন্তু এখনও মেয়ে রেফারীদের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম বলবৎ আছে—বড়দের ম্যাচ খেলাতে দেওয়া হয়না। বলা হয়েছে—"দে আর অনলি অ্যালাউড টু টেক চারজ অফ ইয়ুথ ম্যাচেস।" বড়দের খেলায় মারপিটের সম্ভাবনা আছে। অবশ্য মেয়েরা অন্যমত পোষণ করেছেন। আমরা থাকলে বদ মেজাজীরাও ভদ্র ব্যবহারের চেষ্টা করবেন এবং ফুটবল মাঠে হাঙ্গামা অনেক কমে যাবে। খেলা আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

॥ নৃসিংহ চ্যাটার্জী ॥

১৯৫৬—সি. আর. এ. টেন্ট থেকে তিনজন রেফারী একসঙ্গে যাত্রা করলেন ক্যালকাটা মাঠের দিকে। লীগে মোহনবাগানের সঙ্গে রাজস্থানের খেলা। রমেন বাগচী ও উমা ভট্টাচার্য জানতেন খেলা পরিচালনা করবেন নৃসিংহ চ্যাটার্জী, নৃসিংহ বাবুর ধারণা—এই খেলায় তিনি লাইনসম্যান, রেফারী কিছুতেই নন। কারণ, এর আগে তিনি বড় ম্যাচে খেলাননি। সুতরাং 'কে খেলাবে' এই নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিল ইতিপূর্বে সি. আর. এর জনৈক কর্মকর্তা নৃসিংহবাবুর কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন মাত্র ; খেলাতে বলেননি। এদিকে খেলার সময় হয়ে গিয়েছে। রমেনবাবুর কথায় রাস্তা থেকেই উমা ভট্টাচার্য সি. আর. এর টেনটে ছুটলেন। ফিরে বললেন, নৃসিংহই এ খেলার পরিচালক, আমরা দুজন লাইনসম্যান। এই জন্যই সেদিন খেলাটি পাঁচ-মিনিট দেরীতে শুরু হলেও নৃসিংহবাবু অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে খেলা পরিচালনা করেন। অবশ্য এ সাহস বোধ হয় জন্মসূত্রে পাওয়া। বাবা হরিবিলাসবাবু একদা ডাকাত মেরে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বন্দুক পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কলকাতা ফুটবলের এই অনস্বীকার্য ব্যক্তিটি শুধু ভারতে নয় গতবার মার্ডেকা খেলিয়ে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন মহল ছাড়াও ফিফার প্রেসিডেন্ট স্টানলি রাউজেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। প্রায় পাঁচশ'রও বেশি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলার পরিচালক এ পর্যন্ত আড়াইশ' প্রথম শ্রেণীর হকি ও দেড়শ ক্রিকেট ম্যাচেরও অনস্বীকার্য ব্যক্তি। দুঃখের বিষয় এই মাঠের নেশায় বাবার মৃত্যুর সময়

শয্যাপার্শ্বে থাকতে পারেন নি। ৬৪-র জানুয়ারীতে ইডেনে কোচবিহার কাপের খেলা। পশ্চিমাঞ্চল বনাম পূর্বাঞ্চল। বাড়ি থেকে খবর যখন এল, নৃসিংহবাবুর বাবা তখন পরলোকে "ক্রিকেটের জন্যই বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পারিনি।" ক্রিকেট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন মাঠের বাইরের এই সদাহাস্যময় মিষ্টভাষী লোকটি।

ব্যাক ব্রাশ করা চুল, ঝকঝকে দাঁত, ছিপছিপে কালো লোকটি রোজ কোতরং স্টেশনে সাইকেল রেখে ছুটে ৯-২৯ এর ট্রেন ধরেন বলেই নয়, এ. জি. বেঙ্গলে—অফিসের কাজ কর্ম এবং খেলার মাঠে বাঁশির শব্দ শুনলে অনেকেই চোখ বুজে বলে দিতে পারেন—এ নৃসিংহ চ্যাটার্জী ছাড়া আর কেউ নয়। বিশেষতঃ ফুটবল হকির খেলোয়াড়রা ওকে দেখলে সাবধান হয়ে যান। আইনের একটুও এদিক ওদিক হওয়ার জো নেই। মালয়েশিয়ায় স্ট্যানলী রাউজের কাছে ফ্রি-কিকের আইনটি ঠিক নয় বলে অভিমতও দেন। নৃসিংহ বাবুর মতে ফ্রি-কিকের সময় বিরোধী পক্ষের খেলোয়াড় দশ গজের মধ্যে থাকতে পারেন না ঠিক, কিন্তু যারা ফ্রি-কিক করেন তাঁরা অনেক সময় কিকের অভিনয় করেন। প্রথম জন কিক না করে দ্বিতীয়জন কিক করেন। ফলে বিরোধী দলের খেলোয়াড়রা অনেক সময় বিভ্রান্ত হন। শ্রী চ্যাটার্জী ফ্রি-ফিকের এই রকম প্রথা রহিত করতে অনুরোধ জানালে, স্টানলী রাউজও একমত হন। তবে ইতিমধ্যে ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ম পাল্টানো সম্ভব নয় বলে তিনি জানান।

লীগ, শীল্ড, ন্যাশনাল প্রভৃতি ছাড়াও তাতাবেনিয়ার বিরুদ্ধে এ আই. এফ. এফ. কে খেলালেও নৃসিংহবাবুর ধারণা এদেশে রেফারীর দৌড় বুঝতে হলে যেমন ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের খেলা পরিচালনা করতে দিতে হবে, তেমনি দেখতে হবে বড় টীমের বিরুদ্ধে ছোট টীমের খেলায় যদি বড় টীম হারতে থাকে তখনকার

ডিসিশনগুলো। এখানেই বোঝা যায় রেফারীর বক্তব্য, সাহস নিরপেক্ষতা ও আইনের প্রয়োগ। এবং ঐ সকল গুণের জন্য কোলকাতা রেফারীরা শুধু ভারতে নয়—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এমন কি সমগ্র এশিয়াতে 'বেস্‌ট' বলে নৃসিংহবাবুর ধারণা। তবে খেলার মান সম্পর্কে তিনি সংশয়াপন্ন। আগের চেয়ে মান অনেক নেমে গিয়েছে। তাতাবেনিয়ার বিরুদ্ধে এ আই এফ এফ যেমন খেলেছিল অমন খেলা ভারতীয় দল আর খেলেনি। মানের অবনতির জন্য বহু ভাষা, কোচিং-য়ের অভাব, মাঠের অভাব সামাজিক পরিবেশ ও মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থাই তাঁর মতে দায়ী। বললেন, "রাত্রে খেলা, গ্রামে গ্রামে সারা বছর কোচিং এবং পেশাদারী খেলা চালু না করলে ভারতে কখনই খেলাধূলার উন্নতি হবে না।" দর্শকদের সম্পর্কে ধারণা এরা খুব জ্ঞানী নয়। নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলেই হৈ হল্লা সুরু করে। পয়েন্ট অফ ফ্যাক্ট—নিয়ে ঝগড়া করে, তা নিয়ে নয়। খেলার পর রিপোরটাররা রেফারীর সঙ্গে আলোচনা করলেও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

পঞ্চাশে ভদ্রকালী—কোতরং যুব সংঘের সম্পাদকের অনুরোধে নৃসিংহবাবু শ্রীরামপুর মহকুমার ফুটবল রেফারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও একান্নয় স্পোর্টিং ইউনিয়নের কনকেন্দু চ্যাটার্জীর অনুরোধে হকিরও আম্পায়ার। লীগ, বাইটনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলিয়েছেন। ন্যাশনাল ফাইন্যালের জন্য আম্পায়ারিং পরীক্ষাও দিয়েছেন। পরীক্ষা দিয়েছেন তেষট্টিতে। কিন্তু আজ অবধি তাঁর নাম প্যানেলে আসেনি। "বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসনের কাছে দরবার করেও সদুত্তর মেলেনি।

ফুটবলের রেফারী এবং হকির আম্পায়ার বাহান্নয় খেলার রাজারও (ক্রিকেট) আম্পায়ার এবং এ পর্যন্ত রনজি ট্রফির ১৪টি ম্যাচ পরিচালনা করলেও চুয়ান্নয় সি-এ-বি নক আউট ফাইন্যালে মোহনবাগান—স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলাটি তার কাছে মনে রাখার

মত। মাত্র এক রাণে স্পোর্টিং জিতেছিল। আর নওগাঁয় সনডন স্কুল বনাম পূর্বাঞ্চল খেলায় শেষ উইকেট জুটি পূর্বাঞ্চলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। এটিও তাঁর কাছে স্নায়ু শিহরক ছিল। তাহলেও বাষট্টির বাইটন ফাইন্যালের মতন নয়। সেবার সেন্টাল রেল ও ইস্টবেঙ্গলের খেলাটির কোনদিকে গোল হয়নি, ফলে অতিরিক্ত সময় খেলবার নির্দেশ দেন নৃসিংহবাবু। কিন্তু প্রথমার্ধেও ফল শূন্য দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর আগেই ইস্টবেঙ্গলের সম্পাদক টীম বের করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঠময় ভীষণ হৈ চৈ। হঠাৎ সহকারী সম্পাদক ছুটে এসে টীমকে খেলতে বললেন। ইস্টবেঙ্গল সেদিন একগোলে জেতে।

* * *

তিন কন্যার পিতা। তিনটি প্রধান খেলার পরিচালক হয়েও খুশি নন। জুনিয়রদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ২।৩ বছরের মধ্যে ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে হকি ও ক্রিকেটে বেশি করে মন দিতে চান। আলোচনা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করেছিলাম ; তাহলে কি পালাবেন ?

—ও অভ্যেস অনেক আছে। কালো গাড়ি (পুলিশ ভ্যান) তো থাকেই !

১০ই মে। ১৯৬৬

প্রতুল চক্রবর্তী

ভারতের একমাত্র রেফারী যিনি বিশ্বকাপে রেফারী ছিলেন।
ভারতের প্রথম রেফারী যিনি ফিফা-ব্যাজ পেয়েছেন।

ট্রেনে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ উত্তরপাড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দেখি একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি আর চুলভরা মাথা, পরনে লুঙ্গি আর গরদের পাঞ্জাবি—প্রতুল চক্রবর্তী। আমাদের কামরায়ই উঠলেন।

"এই একটু তাস খেলতে এসেছিলাম। বাড়ি যাচ্ছি।

কোন্নগরে নেমে গেলেন। ঢাকা তেজগাঁয়ের এই তেজী লোকটি যাঁকে দেখে বুঝবার উপায় নেই খেলার মাঠে কি কঠোর ব্যক্তিত্ব বিকীরণ করেন অনস্বীকার্যের ভূমিকায়।

* * *

দুপুর থেকেই বৃষ্টি শুরু। গোটা আকাশটাই একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে। দোসর ঝড়। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তীরের মত বিঁধছে। গ্রীয়ার তাঁবুতে সেদিন মাত্র দুজন রেফারী উপস্থিত। ঠিক হল, প্রথম ডিভিসনের দুটি খেলা ছাড়া আর সব বাতিল। তাহলেও কাকে কোন খেলা পরিচালনার জন্যে পাঠান যায়—চিন্তা করছিলেন সি আর এ-র জনৈক কর্মকর্তা। বিশেষত ইস্টবেঙ্গল মাঠে রাজস্থান বনাম ডালহৌসীর খেলাটার ভার কাকে দেওয়া যায়। কাছেই ছিলেন প্রতুল চক্রবর্তী। এর আগে কখনও ফার্ষ্ট ডিভিসনে খেলাননি। দায়িত্ব তাঁর উপরেই এল। প্রতুলও সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করলেন। এইভাবে জীবনের প্রথম আশা পূরণ। ভাগ্যিস ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল, সেবার ১৯৫১ সনে।

ঝড় বোধহয় এর আগেও। ১৯৪৭-এ। চুয়াল্লিশে ঢুকেছিলেন ঢাকা রেডিওয়। স্বাধীনতার বৃছরে সোজা দিল্লীতে এবং ওই বছরের শেষ মাসে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে। ব্যতিক্রম এখনও। সেন্ট গ্রেগরী স্কুল ও জগন্নাথ কলেজের ছাত্র এবং ঢাকা উয়াড়ীর গোলকীপার আজ আটচল্লিশ বছরেও (জন্ম ঃ ১৯১৮) অবিবাহিত।

বাইশ বছর বয়সে রেফারী হওয়ার আগে ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের 'রেফারী-পরীক্ষায়' উত্তীর্ণ। ওখানে যেমন লীগ খেলাতেন, তেমনি সঙ্গে রোনালডসে শীলডও। তথাপি ঢাকার বড় বড় খেলার পরিচালক কলকাতায় এসে আবার কিছুদিন 'স্বরে অ স্বরে আ'। পাওয়ার লীগের রেফারী। অতঃপর শনৈঃ শনৈঃ প্রমোশন। দেশে যেমন ডুরানড, রোভারস, সন্তোষ ট্রফি, আই এফ শীল্ড ও লীগের পরিচালক, তেমনি কখনও দেশ ছেড়ে বাইরে—পিকিং, কুয়ালালামপুর বা ঢাকা। টুরনামেন্ট ঃ এশিয়ান কাপ, বিশ্বকাপ, এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার ও মারডেকা। প্রতিযোগী দেশও অনেক—ভারত, বরমা, সিংহল, পাকিস্তান, চীন, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া ইসরায়েল, হংকং, কোরিয়া ও মালয়। এর মধ্যে সাতান্নের জুনে পিকিংয়ে বিশ্বকাপের (পূর্বাঞ্চল) প্রাথমিক পর্যায়ের ফাইন্যালের কথা প্রতুলবাবু কিছুতেই ভুলতে পারেন না। দু দলই সমান ছিল। একদিকে ইন্দোনেশিয়া, অপর দিকে ড্রাগন স্ব-ভূমিতে অবতীর্ণ। ৯০ মিনিটের খেলায় এই তাঁর প্রথম রেফারিং। খেলা খুব পরিচ্ছন্ন হলেও উত্তেজনার অন্ত ছিল না। আট মিনিটের মধ্যেই গোল শুরু। এরা গোল দিলে ওরা শোধ করে। আবার ওরা দিলে এরাও। প্রথম গোল দেয় চীন। তারপর ১—১। আবার চীন এগিয়ে ১—১, আবার ২—২। এবার ইন্দোনেশিয়া আগে ৩—২। ও পরে চীন ৩—৩। আবার চীন ৪—৩। এবং শেষ গোলটি খেলা শেষের মাত্র পাঁচ মিনিট আগে।

প্রতুলবাবু আর যে খেলাটির কথা কখনও ভুলবেন না, সেটি

১৯৬১ সনের আগষ্টে কুয়ালালামপুরে মারডেকার ফাইন্যাল। প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ মালয় ও ইন্দোনেশিয়া।

মালয় ছিল পূর্ব বৎসরের বিজয়ী তদুপরি স্বদেশের মাটিতে খেলা, কাজেই সম্মান রক্ষায় তারা বদ্ধপরিকর এবং মরীয়াও। অথচ তারাই প্রথম গোল খেল। শুধু খেলোয়াড় কেন দর্শকদের মধ্যেও উত্তেজনার অন্ত নেই। গোল শোধ হল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ইন্দোনেশিয়া আবার গোল চাপাল। এবার যে উত্তেজনা তাতে থর থর করে মাঠের ঘাসও কাঁপতে শুরু করে। প্রতুল চক্রবর্তী সেই মুহূর্তে তখন ভারতবর্ষ,—মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার মাঝে। প্রতি মুহূর্তেই তিনি নিরপেক্ষতার পরীক্ষার সম্মুখীন।

শেষের ১৫ মিনিট বাকী। ইন্দোনেশিয়ার গোলের সামনে বল। জোর ট্যাকলিং-এ বল শূন্যে উঠে পড়ল ধরাশায়ী ব্যাকের হাতের উপর। দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হল চীৎকারে 'রেফ…… পে-না-ল-টি' অকম্পিত রইল ভারত। হ্যাণ্ডবল স্বেচ্ছাকৃত নয়। মালয় পেনালটি পেল না।

আর তিন মিনিট বাকি। ইন্দোনেশিয়ার গোল সীমানায় বল। মালয়ের রাইট ইন বল পেয়ে আয়ত্বে রাখতে পারল না। ছুটে আসছে ব্যাক। মালয়ী খেলোয়াড় বিশ্রীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল কেড়ে নিয়ে বেরোল। সামনে অসহায় ইন্দোনেশিয়ার গোলরক্ষক। গোল অবধারিত। হাজার হাজার মালয়ী চীৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল প্রতুল চক্রবর্তীর বাঁশির ধমকে। মালয়ের ফাউল। বিপজ্জনক ট্যাকলিং-এর জন্য।

মালয় হারল। কিন্তু ছুটে এল দুই দলের কোচ। কোন অভিযোগ নেই তাদের। নিরপেক্ষ বিচার কাকে বলে এই টুরনামেন্টে প্রথম দেখলাম—বললেন জাপানী দলের জার্মান কোচ। আর টুঙ্কু আবদুল রহমান প্রতুলকে ডেকে এনে বললেন, "এ খেলায় আসলে জিতল ভারত। নেহেরুর নিরপেক্ষ নীতির ভারত।"

* * *

ভাল রেফারী হওয়ার জন্য প্রতুলবাবু অনেক নিয়মকানুন মেনে চলেন। ফুটবলের আইন কঠোর ভাবে অনুসরণ করেন। তাঁর অভিমত : ঠিক সময়ে ঠিক নিয়মের প্রয়োগ এবং মুহূর্তের মধ্যেই এই হল রেফারীর সাফল্যের চাবিকাঠি। এজন্য দরকার আইনজ্ঞান, প্রখর বাস্তববোধ, ঐকান্তিক ইচ্ছা, সাহস এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব। রেফারীকে একটা খেলায় সাত আট মাইল দৌড়তে হয় বলে তিনি দম বাড়াবার জন্য রোজ সকালে দৌড়াতেন। রেফারীর চার্ট সব সময় কাছে রাখতেন।

রেফারীর আরও গুণ থাকা উচিত খেলোয়াড়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই হবে। প্রতুল কোনদিন কাউকে মাঠ থেকে বের করেননি। তাঁর চোখের চাউনিতেই বুক কেঁপেছে অপরাধীর। রেফারীংয়ের মান সম্পর্কে প্রতুলবাবুর ধারণা, কলকাতা এ বিষয়ে ভারতের সেরা। প্রায় পাঁচশ প্রথম শ্রেণীর খেলা পরিচালনা দিয়ে অনেকের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর কথায় মান্না, জার্নেল, মেওয়ালাল, ভেঙ্কটেশ, অপ্পারাও, তাজ মহম্মদের মতন খেলোয়াড়েরা মাঠে থাকলে কাজ অনেক হালকা হয়ে যায়।

২৯শে মার্চ, ১৯৬৬

চারটি প্রস্তাব : ছয়জনের মত

ইন্টার ন্যাশনাল ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) প্রেসিডেন্ট স্যার স্ট্যানলী রাউজের ধারণা,—ফুটবল তার দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা ক্রমশই হারাচ্ছে। রক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রসারই এজন্য

প্রধানত দায়ী। ফুটবলের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি কতকগুলি আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব এনেছেন।

(১) থ্রো-ইনের বদলে ফ্রী-কিক্।

(২) ১৮ গজ লাইনকে দুদিকে টাচ্ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া।

(৪) মাঠের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (১৮ গজের আগে) অফসাইড হবে না।

(৪) এই ব্যবস্থায় শুধু মাত্র ১৮ গজের মধ্যেই পেনাল্টি দেওয়া হবে।

স্যার স্ট্যানলী রাউজের ওই চারটি প্রস্তাব নিয়ে কলকাতার ছ'জন অভিজ্ঞ ফুটবল খেলোয়াড়ের মতামত সংগ্রহ করেছি।

এদের তিনজন রক্ষণভাগের! যথা: সনৎ শেঠ, অরুণ ঘোষ, জার্নাল সিং। আর তিনজন আক্রমণ ভাগের। যথা: পি. কে. ব্যানার্জি, এস সমাজপতি ও নীলেশ সরকার। সুতরাং মতের গরমিলও রয়েছে যথেষ্ট।

ভেবেছিলাম সবার আগে জার্নাল সিংয়ের ইণ্টারভিউ নেবো। তাঁর কলকাতার আস্তানা ব্রডওয়ে হোটেলে না পেয়ে, গেলাম মহঃ স্পোর্টিং মাঠে। খেলা হচ্ছিল হাওড়া ইউনিয়ন ও মোহনবাগানের।, মোহনবাগান একাধিক গোলে জিতলেও খেলা শেষে সমর্থকরা কেন যে জার্নালের উপর তিরিক্ষি হয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। খেলা ছেড়ে জার্নাল মাঠ ছেড়ে মোহনবাগান টেন্টের দিকে যখন যাচ্ছিলেন, তখন সমর্থকরা এমনভাবে টিটকারী ওকে দিয়েছিলেন যে, একটা কথাও বলবার সুযোগ পাইনি। সুতরাং মুহূর্ত মধ্যে নিশানা পাল্টে ইস্টবেঙ্গল টেন্টের দিকে রওনা হলাম। ক্লাবে ঢুকেই দেখি—সমাজপতি স্যুট-বুট পরে খোসগল্প করছেন।

একঘণ্টা বাদে ফিরে গেলাম মোহনবাগান টেন্টে। জার্নাল তখন স্নান সেরে খাটো প্যাণ্ট পরে খালি গায়ে এলো চুলে টিফিন

করছিলেন। ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কথা শেষ করলেন।

টেলিফোনে এনগেজমেণ্ট হয়েছিল পি. কে-র মিসেসের সঙ্গে। কেন না রাত ৯টাতেও পি. কে বাড়ি ফেরেননি। শুনেছিলাম হুদিন পর বোমবাই যাবেন। সাড়ে ছ'টায় কাইজার স্ট্রীটের কোয়ার্টারে হাজির হলাম। পি. কে তখনও নিদ্রাদেবী সমোনসের আওতায়। একটু পরেই চোখ মুছতে মুছতে হাজির হলেন।

অরুণ ঘোষের সঙ্গেও অনুরূপ দূরভাসে। পরদিন গার্ডেনরীচের মাঠে বসেই নিয়েছিলাম ইণ্টারভিউ। তবে বেগ পেয়েছিলাম সনৎ শেঠকে নিয়ে। হুদিন ঘুরেও এরিয়ানস্ ক্লাবে ওঁর পাত্তা পাইনি। স্টেটব্যাঙ্কের হেড অফিসে কাজ করেন। গিয়ে দেখি শেঠ কাজে ব্যস্ত। কাজের শেষে কথাবার্তা হল।

সহজে দেখা হয়েছিল নীলেশ সরকারের সঙ্গে। হরতালের দিন অফিস করতে হবে বলে বালীতে বালী প্রতিভার ক্যাম্পে না গিয়ে খিদিরপুরে রামকমল বসু স্ট্রীটের বাড়ীতেই রাতে ছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব

ইচ্ছে করে বল বাইরে পাঠালে থ্রো ইনের বদলে ফ্রী-কিক্ প্রবর্তন সম্পর্কে পি. কে. সমাজপতি ও অরুণ ঘোষ প্রায় একমত। নীলেশের মত ভিন্ন। এ নিয়মে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন দলকে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে বলে তাঁর অভিমত। তবে এতে যে ফরোয়াডদের সুবিধা হবে সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ। সনৎ সর্বদাই ফ্রী-কিকের বিরুদ্ধে। জার্নাল আবার নতুন নিয়মের পক্ষে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আঠার গজ লাইনকে দুদিকে টাচ লাইন অবধি বাড়িয়ে দিলে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা থাকবে না বলে জানিয়েছেন অরুণ ঘোষ ও সমাজপতি। নীলেশ ও পি. কের মতে এতে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই হবে। তবে সনৎ এই প্রস্তাবের পক্ষে। ভাল গোলকীপারেরা এর সমর্থন করবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। জার্নালের ভয়—লোভের বশে গোলকীপারেরা গোল ছেড়ে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।

তৃতীয় প্রস্তাব

পি. কে. ব্যানার্জী অফসাইডে নতুন প্রস্তাবের পক্ষে 'স্কোরার হিসাবে' তিনি এটা পচ্ছন্দ করেন। জার্নালের মতও তাই। সমাজপতির অভিমত অন্যরকম—"অফসাইডের নিয়ম সম্পর্কে এতটা কঠোর হওয়া ঠিক হবে না। বর্তমান নিয়ম সংশোধন করলে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হবে। অরুণ ঘোষ 'হ্যাঁ' বা 'না' বলেন নি। অফসাইডের নিয়ম পরিবর্তন করলে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা বেশি সুযোগ পাবেন বলে তাঁর ধারণা। শেঠ অফসাইডের নতুন প্রস্তাবের বিরোধী। নীলেশ সরকার বললেন, অফসাইডের আইন সংশোধন করা হলে কম ও অধিক শক্তিশালী উভয়েরই সুবিধা হবে।

চতুর্থ প্রস্তাব

সমাজপতি, অরুণ ঘোষ ও নীলেশ সরকার পেনাল্টির বর্তমান নিয়ম পরিবর্তনে রাজি নন। জার্নাল সিং ফিফার প্রেসিডেণ্ট স্যার ষ্ট্যানলীর নিয়মটাকে 'অতি উত্তম' বলেছেন। এতে খেলোয়াড়রা অত্যন্ত সাবধান হবে। সনৎ শেঠ বললেন, অমি নিজে যেমন এই প্রস্তাবের সমর্থন করব, তেমনি বলব—স্যার স্ট্যানলীর এই প্রস্তাব কেবল গোলকীপার নয়—সমগ্র টীমের পক্ষেই মঙ্গলকর। পি. কে. এ ব্যাপারে একেবারে উল্টো কথা বললেন। তাঁর মতে—নতুন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পক্ষে অমঙ্গলজনক, তবে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের সুবিধা হবে।

মোহনবাগানের হেড মালী গোকুল সুঁই

বাবুরা যদি খারাপ খেলে আমি উৎসাহ দিই। তারপরও হেরে গেলে দু তিন দিন ভাত খেতে পারি না, আর ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে হারলে আমার মেজাজ পাগল হয়ে যায়। আর কোন কেলাবের পেলেয়ার আমার ভাল লাগে না। এটা আমার নিজের কেলাব আছে। না হলে এতদিন অন্য কেলাবে ঢুকতাম। সত্যি সত্যিই চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে মোহনবাগানের বড়মালী

গোকুল সুঁই অন্য কেলাবে যাওয়ার কথা কদাচ চিন্তা করে নি। না হলে "কত বাবু এনু, কত বাবু ক্লাব ছেড়ে চলে গেনু, আমি এখনও আছি। এ কেলাব তো আমার নিজের ঘর। থারটি টু-তে কাজ করনু, গোল্‌ডেন জুবিলী, ডায়মণ্ড জুবিলী, প্লাট্রিকান (প্লাটিনাম) জুবিলী দেখনু, আশা আছে—আর একটা জুবিলী দেখব।"

গোকুলের সঙ্গে যখন আলাপ শুরু করেছিলাম, ওর সহকর্মীরাও কৌতূহল বশত দাঁড়িয়েছিল ? মাঝে ওদের দিকে যখন তাকিয়েছি, —মাথা নেড়ে বলেছে—"হ্যাঁ, গোকুলের সব কথা ঠিক আছে।"

—তোমরা কিছু বল।

"—না, ঐ বলুক ও আমাদের সকলের উপরে আছে।"

আবার গোকুল শুরু করছে।

—"আমি তখন করপোরেশনে কাজ করতাম। "টয়েনটি এইটে" লেখাপড়া না জানলেও মাঝে মাঝে সে দু একটি ইংরাজী বলে। (বাবুদের কাছে শিখনু)। "চোদ্দ টাকা মাইনে করপোরেশনে কাজ করতাম। থারটি টু-তে বেকার হয়ে গেলাম। কপাল ভাল ছিল। মোহনবাগানের ম্যানেজার প্রফুল্ল বিশ্বাস আমাদের বাসায় পটলডাঙ্গায় এসে বললেন, বুড়োলোক চাই। আমি বললাম, বুড়ো নেই বাবু, আমি আছি, সব কাজ জানি। বাবুর পছন্দ হল। পরদিন সকালে চোদ্দ টাকা মাইনের কাজ আরম্ভ করনু। আমাদের কেলাবে মেম্বাররা তখন মাসে চার আনা চাঁদা দিতেন। মেম্বার ছিলেন আট ন-শ'। টেণ্ট খুব ছোট ছিল। তখন আর ইখনে কেলাব কত কত চেনজো হইচি !"

'প্রফুল্লবাবু কেবল ম্যানেজার ছিলেন না, মাঠের সব কাজ তিনি জানতেন। ক্রীকেট পীচ, স্পোরটো, ফুটবল—যত বড় বড় খেলা সব মাঠের কাজ আমি বাবুর কাছে শিখনু। কেলাবে গেল্‌আরি ছিল না। বড় খেলা হলে—নারকেলের দড়ি আছে—ঐ দড়ি ঘিরে খেলা হত। গ্যালারি ছিল না ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের। বাবুরা

তাই সাউথ ক্লাবের গেলারি ভাড়া করতেন। তবে খেলা খুব ভাল ছিল। গোষ্ঠবাবু, বলাইবাবু, মন্মথ দত্ত, সতু চৌধুরী, কুমারবাবু, নন্দ রায়চোধুরী, শরৎদাস, টি আও, মানা গুঁই, এম এন ব্যানার্জী, মাতাল মিত্তির খুব বড় বড় পেলেয়ার ছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের মজিদ খুব ভাল ছিলেন। পঁয়ত্রিশ সাল যখন, মেমবার বাড়িল। সুধীর বাবু আর মাতাল মিত্তিরবাবু ক্লাবের টুম্বু বড় করিলেন। সে বছর মোহনবাগান হকি লীগ পাইল, উনচল্লিশে ফুটবললীগ। কিন্তু শীলডো পাইল সেই এগার সালের পর সাতচল্লিশে। খেলায় তখন ভীড় ছিল না। চল্লিশ সাল থেকে ভীড় আরম্ভ হল। কিন্তু এই তিন টীমের (মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের) খেলা ছাড়া অন্যগুলোর নয়।

স্মৃতিচারণ করে গোকুল আরো বলল, —"আগে কোনবাবু বুট পরতেন না। খুব বৃষ্টি হলে হাফ বুট পরতেন। সে সাল মনে হয় চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ। সেনটার হাফ হামিদ প্রথম বুট পরা শেখান। তখনকার বাজারে খেলাটা খুব ভাল ছিল। সাপোটারদের মারা-মারি গালাগালি ছিল না। বাবুরা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে খেলে বাড়ি যেত। ক্লাব থেকে একটা পেলেয়ারকে, একটার বেশি লেমনেড দেওয়া নিষেধ ছিল। মোজা, অ্যাংকোলেট, নীকাপো কোথায় ছিল? শাড়ির পাড় ছিড়ি করে সব ব্যানডেজো বাঁধিত।"

গোকুল দলের সঙ্গে বহুবার বোমবাই, দিল্লি, মাদরাজ, কালিকট গিয়েছে। কিন্তু সাতচল্লিশে বোম্বের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামের ঘটনা সে আজও ভুলতে পারেনি। "একটা গোরা টীমের সঙ্গে মোহন-বাগানের খেলা। কুড়ি মিনিটের সময় মোহনবাগানের মেওয়ালাল একটি গোল দিল। সে গোলের আনন্দে সব বাবু হৈ-হৈ শুরু করিল, নাচিল। সমস্ত গেলারি ভাঙ্গি পড়িল। সেবার আমি মরি মরি বাঁচিলাম। না হলে কটক জিলার অলারপুর গ্রামের (জাজপুর মহকুমা) গোকুল এতদিন কোথায় থাকিত!"

গোকুলের ধারণা ঃ "এরকম মাঠ তুনিয়াতে নেই। ক্যালকাটা মাঠ খুব ভাল। কেউ তৈয়ারী করতে পারেনি। মাঝে একটু খারাপ হইছিল। সায়েবদের এখন মেবারক কম, টাকা নাই। আমরা এসে আবার গ্রাউণ্ড ঠিক বানাইছি। হাঙ্গেরী (তাতাবানিয়া) বহু পছন্দ করচি, জারমানি স্পোরটো করে গেল!"

তিন ছেলের বাবা গোকুল চুয়ান্নয় পড়েও এবং সকাল সন্ধ্যে কাজ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মাঠের খেলার নিত্য দর্শক। এ নেশা আছে। কয়েক বছর আগে মোহনবাগানের প্র্যাকটিশের সময় সেও মাঠে নামত। আরও কথা মাঝে মাঝে প্লেয়ারদের বলত, "এরকম মার, সেরকম কর। 'খেলাতো জানি, এত বছর দেখনু এ লেখাপড়ার কথা না, বুদ্ধি পছন্দের কথা।' একটু বড় হলে ছেলেদের খেলা শেখাবে নিজে্ 'বাজার খারাপও অর্থাভাব (মাইনে ৮৯·৩৫ পয়সা) নইলে কলকাতাতেই ওদের রাখত।

৭ই জুন। ১৯৬৬

ইষ্টবেঙ্গলের হেডমালী তুখীরাম

"টফি না পেলে কি হবে, আগের চেয়ে টীম ভাল হয়েছে।" ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বড় মালী তুখার মন্তব্য এই। হাবামালীর বক্তব্য বিপরীত ঃ "আজকাল কি ভাল পেলেয়ার আছে?" যত সব চাংড়া ছেলে আছে। আমারো কথা বিশ্বাস না যাবে তো, গোষ্ঠবাবু তো আছি। কি বলিবে? দেখবে হাবা ঝুটা কথা বলেনা। তাজ মহম্মদের মত খেলিতে পারিব? এত্তো পেলেয়ার তো আছে!"

তুখীরাম রাউত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হেডমালী হলেও হাবা সিনিয়র,

মাইনেও এক টাকা বেশী (৮৬)। সব কিছুর তদারকীর ভার দুখার উপর থাকলেও হাবার মতামত উপেক্ষা করা চলে না। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা দুখা যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনি কাজ পাগলা। ‘ষাট বছরেও রোদ বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। ১০৮ ডিগ্রির (১১ মে) ভরদুপুরে মাঠে কাজ করতে দেখে জিজ্ঞেস করায় দুখা বলেছিল, “বাবু, এ রোদে কিছু হবেনা। যারা রিকসা চালায়, ঠেলাগাড়ি ঠেলে তাদের কথা ভাবুন তো।

দুখার সবুজ লুঙ্গী ঘামে ভিজে, পৈতে গায়ে লেপটান, মাথার গামছা খুলে গা মুছে হেসে টেন্টে ফিরে এল। ভেবেছিলাম দুখা এবার বিশ্রাম করবে। কিন্তু না, আমাকে তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলে নেওয়ার অনুরোধ জানালো। জিজ্ঞেস করলাম ঃ এমনভাবে কতকাল চলবে ?

—শরীর যতদিন চলে ! তবে শরৎটা মানুষ হওয়া পর্যন্ত কাজ করতে হবে।

শরৎ তার ছোট ছেলে। বড় অভিমন্যু, জন্ম বিকলাঙ্গ। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। তাই সাত বছরের শরৎই আশা ভরসা। ‘এখন দেশে সে ডি. কেলাসে পড়ে। বড় হলে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বে আর ফুটবল খেলাও শিখবে।’

—বিদ্যাসাগর কলেজ কেন ?

—বিদ্যাসাগর খুব পণ্ডিত লোক। পণ্ডিত লোকের কলেজে পড়লে আমার শরৎও একটু পণ্ডিত হবে।

—শরৎকে কোথায় রাখবে ? তোমার এই টিনের চালা ঘরে ?

—না ! বাবুদেরকে বলে হোষ্টেলে রাখিব। আমার টাকা কোথায় ? দুখার ছেলের জন্যে কি এতজন বাবুর একজনও মুখ ফিরাবে না ? ভাল লোক এখনও দু একজন দেশে মিলিবে।

ছোটবেলায় দাদা শুকদেব রাউতের কথায়—কটকের গ্রাম (গৌরশাহী) ছেড়ে এসে যখন চাকরি নেয়—ইস্‌টবেঙ্গল ক্লাব

তখন কুমারটুলিতে। ময়দানে শুধু 'চেয়ার টেবিল ছিল, মোহন-বাগানের আলমারীতে আমরা অন্য জিনিসপত্র রাখিতাম।' গ্যালারী টিকিট না থাকলেও 'এখানকার মত মারপিট হত না।' 'সাত আট বছর কুমারটুলিতে কাজের পর এখানে ক্লাব উঠে আসে।' ক্লাব টেন্টে তখন ইলেকট্রিক আসেনি। পানীয়জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে ফোর্ট থেকে দুখা বাঁকে করে জল নিয়ে আসত। 'সব কথা মনে নেই তবে গোরা টীম তখন খুব ভাল ছিল। বাঙালীবাবুদের টাউন কিলাব, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান। সায়েবদের কালকাটাও খুব ভাল ছিল। আমাদের কিলাবে তাজ মহম্মদ বাক আর কেপটেন তালুকদার বাবু, আর পি চক্রবর্ত্তী খুব ভাল ছিলেন। সাপোটারও খুব ভাল ছিলেন। এখন যেমন কেউ খারাপ খেললে বলে—কেন শালা এমন খেললি, তোর ঠ্যাং ভেঙ্গে দিব। এমন কথা তখন বলা নয়, কোন পেলেয়ারের গায়ে হাত দেওয়ার কথা কেউ চিন্তাও করিত না।'

হেডমালী-হলেও প্রায় চল্লিশ বছরের চাকুরি জীবনে অনেকদিন আগে দুখার একবার ব্রেক সারভিস হয়। দুখা ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে স্পোর্টিং ইউনিয়নে চলে গিয়েছিল। তাই হাবা সিনিয়র।—'তবুও ক্লাব আমার সাথে বেইমানি করেনি। আমি ফিরে এসেও হেডমালী হই।'

সকাল ছ'টায় বলুন আর রাত দশটাই হোক—দুখার রেস্ট নেই। যেন বারমাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। ফুটবলের পর ক্রিকেট, অ্যাথলেটিকস্, হকি। এরমধ্যে আবার টেনিস, ব্যাডমিন-টনও। গ্রাউণ্ড, পীচ—সব দুখাকেই তৈরী করতে হবে। স্পোরট-সের মার্ক ঠিক হল কিনা তাও দেখা চাই। অবশ্য এখন আর বল পাম্প করতে হয় না, ওসব জগবন্ধু করে। তাছাড়া ফুরশীকেশ শ্যামল ও চৈতন্য নায়েক বেশ ভাল ছেলে। "কেলাবে একদিন না থাকলে হৈ হৈ পড়িবে আবার ও দিকে টীমের সঙ্গে বাইরেও চল।'

ছুখা এ ব্যাপারে খুব খুশি। প্লেনে গৌহাটি, দিল্লি বোম্বাই, দেরাদুন ছাড়াও ঢাকা, ময়মনসিং, নারায়ণগঞ্জে গিয়েছে।—কিন্তু বাবু যাওয়া বড় কষ্ট।' একটু কাজ হালকা থাকলে? বছরে একবার অভিমন্যু শরৎ আর ওদের মা'র জন্য জামাকাপড় নিয়ে দুঃখা এক মাসর জন্য দেশে যাই। দেশী লোক গেলে কিছু পাঠাই। তবে এখন যা বাজার আছে—তাতে তিরিশ টাকার বেশি পাঠান যায় না। আগে পনের টাকা মাইনে পেয়েছি তো দশ টাকা দেশে মনি-অর্ডার করেছি।"

দুখার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে হাবা বলল, এ বাবু সারভিস আছে নাকি। প্রভিডেণ্ডো ফানডো নাই। তবে কি জানেন? এ চাকরীর আরাম আছে। দুখা, হাবারে কেউ ছাঁটাই করতে পারিব? কেউ না। আর গরমেণ্টো চাকরি করিব তো দুইশ' টঙ্কা মিলিব ঠিক তো খরচ হইব আড়াইশ'। এখানে কিছু কিছু বকশিস মেলে —বাবু পাকিস্তানের বঙ্গাল লোক আছে—এ বাবুলোকে মন ভাল আছে। লীগ শীল্ড পাইলে মোটা টঙ্কা বকশিস পাইব।'

হাবামালীর বক্তৃতা শুনে ইতিমধ্যে একে একে সকলে চলে গিয়েছে। সব শেষে দুখা যাওয়ার আগে বলল: বাবু টঙ্কা বাড়ির এমন কথাই লিখুন।

কয়েকটি প্রধান ট্রফির গত সাত বছরের খতিয়ান

সন্তোষ ট্রফি

১৯৬০-৬১	সার্ভিসেস	(১—০)	বাংলা
১৯৬১-৬২	রেলওয়ে	(৩—০)	মহারাষ্ট্র
১৯৬২-৬৩	বাংলা	(২—০)	মহীশূর
১৯৬৩-৬৪	মহারাষ্ট্র	(১—০)	অন্ধ্র
১৯৬৪-৬৫	রেলওয়ে	(২—১)	বাংলা
১৯৬৫-৬৬	অন্ধ্র	(১—০)	বাংলা
১৯৬৬-৬৭	রেলওয়ে	(২—০)	সার্ভিসেস

আই এফ. শীল্ড

১৯৬০	মোহনবাগান	(১—০)	ইণ্ডিয়ান নেভি
১৯৬১	ইস্টবেঙ্গল	(যুগ্মবিজয়ী)	মোহনবাগান
১৯৬৩	মোহনবাগান	(৩—১)	হায়দ্রাবাদ একাদশ
১৯৬৩	বি. এন. আর.	(১—০)	মহঃ স্পোর্টিং
১৯৬৪	ইস্টবেঙ্গল	(খেলা হয়নি)	মোহনবাগান
১৯৬৫	ইস্টবেঙ্গল	(১—০)	মোহনবাগান
১৯৬৬	ইস্টবেঙ্গল	(১—০)	বি. এন. আর

ডি. সি. এম

১৯৬০ ইস্টবেঙ্গল	(৩—১)	মহঃ স্পোটিং
১৯৬১ মহঃস্পোর্টিং	(২—১)	মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার
১৯৬২ মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার	(১—০)	মফতলাল গ্রুপস্
১৯৬৩	(চীনা আক্রমণের জন্য খেলা বন্ধ ছিল।)	
১৯৬৪ মহঃস্পোর্টিং	(১—০)	অন্ধ্রপুলিশ
১৯৬৫ অন্ধ্রপুলিশ	(২—০)	হায়দ্রাবাদ সেণ্ট্রাল পুলিশ লাইন।
১৯৬৬ পাঞ্জাব পুলিশ	(২—০)	লীডার্স ক্লাব।

ডুরাণ্ড

১৯৬১ মোহনবাগন	(যুগ্ম বিজয়ী)	ইস্টবেঙ্গল
১৯৬১ অন্ধ্রপুলিশ	(১—০)	মোহনবাগান
১৯৬২	খেলা হয়নি	
১৯৬৩ মোহনবাগান	(২—০)	অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬৪ মোহনবাগান	(২—০)	ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৫ মোহনবাগান	(২—০)	পাঞ্জাব পুলিশ
১৯৬৬ গুর্খা ব্রিগেড	(২—০)	শিখরেজিমেণ্ট

রোভার্স

১৯৬০ হায়দ্রাবাদ পুলিশ	(১—০)	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৬১ ই. এম. ই	(১—০)	মোহনবাগান
১৯৬২ ইস্টবেঙ্গল	(যুগ্মবিজয়ী)	অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬৩ অন্ধ্র পুলিশ	(১—০)	ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৪ বি. এন. আর	(১—০)	মোহনবাগান
১৯৬৫ মফতলাল মিলস্	(১—০)	মোহনবাগন
১৯৬৬ মোহনবাগান	(১—০)	গোয়া ভাস্কো ক্লাব।

কলকাতার প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যামপিয়ন

১৯৪৭ — খেলা হয়নি
১৯৪৮ — মহামেডান স্পোর্টিং (অপরাজেয়)
১৯৪৯ — ইস্টবেঙ্গল
১৯৫০ — ইস্টবেঙ্গল (অপরাজেয়)
১৯৫১ — মোহনবাগান
১৯৫২ — ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৩ — খেলা অসমাপ্ত
১৯৫৪ — মোহনবাগান
১৯৫৫ — মোহনবাগান
১৯৫৬ — মোহনবাগান
১৯৫৭ — মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮ — ইস্টার্ণ রেল
১৯৫৯ — মোহনবাগান
১৯৬০ — মোহনবাগান
১৯৬১ — ইস্টবেঙ্গল
১৯৬২ — মোহনবাগান
১৯৬৩ — মোহনবাগান
১৯৬৪ — মোহনবাগান
১৯৬৫ — মোহনবাগান
১৯৬৬ — ইস্টবেঙ্গল

সর্বাধিকবার লীগ পেয়েছে মোহনবাগান। এ পর্যন্ত ১২ বার উপর্যুপরি সর্বাধিকবার লীগ পেয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং। ৫ বার (১৯৩৪-১৯৩৮)

ফুটবল কোথা থেকে এল?

ফুটবল কোথা থেকে এল, ভারতেই বা কীভাবে এল এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। তবে আদিম যুগে নাকি এর প্রচলন ছিল, কিন্তু ভারতে নয়। অবশ্য ফুটবল অন্যভাবে খেলা হত বলেই তাদের ধারণা। বর্তমানের ফুটবলের সঙ্গে আদিম যুগের ফুটবলের কোনই মিল নেই। কেউ কেউ বলেন, রাগবীর উন্নত সংস্করণ ফুটবল। এর রূপ পরিবর্তন হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষ চলে এসেছেন শহরে। এসেছেন কলকারখানায় কাজ করার উদ্দেশ্যে। সারাদিন কাজ। কিন্তু তারপর? আনন্দের খোরাক কোথায়? একলা খেলে তো আনন্দ পাওয়া যায় না। যে খেলায় যত বেশি লোক, যত বেশি লোক দেখতে আসবে ততই আনন্দ। কী খেলায় এমন আনন্দ আছে। সকলে বেছে নিলেন ফুটবল। ১১+১১=২২ জন খেলবে। দর্শক থাকবে অনেক, অসংখ্য। তারা উপভোগ করবেন, আনন্দ পাবেন। এমন খেলাই চাই। ইওরোপের বিভিন্ন শহর, গ্রেটব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরেও ছড়িয়ে পড়লো এই খেলা। ঘরের কোণে যারা বসে একক আনন্দ উপভোগ করতেন, যেন তেন প্রকারেণ তারা বেরিয়ে এলেন খোলামাঠে।

কিন্তু শুধু ব্লাডার দিয়ে তখন খেলা হত। ষোড়শ শতাব্দীর গ্রেটব্রিটেনেও এর প্রচলন ছিল। তবে তা গ্রামাঞ্চলে। 'সভ্যরা' বলতেন, এসব নিচু শ্রেণীর লোকদের খেলা, ভদ্রলোকে খেলে না। মাঠের হৈ হল্লা ওরা পছন্দ করতেন না। কেউ কেউ তো আইন

করে বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। অর্ডিন্যান্স জারীও হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ফুটবল খেলা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গে যেমন ঢাল, সড়কী নিয়ে ধান কাটা হয়, লাঠিয়াল থাকে, তেমনি তৎকালে ওদেশের ফুটবলের মাঠেও দেখা যেত। এই 'লাথি মারা খেলায়' বন্দুক, লোহার রড, ছোরা নিয়ে মাঠে আসতেন উভয় দলের লোক। কিন্তু ক্রমশঃ এ অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুটবল আর অপাংক্তেয়দের খেলা নয়। স্কুলে স্কুলে এর প্রচলন দেখা গেল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এর মর্যদা দিতে লাগলেন। মাস্টার মহাশয়রাও এর পক্ষে ছিলেন। তবে নীরব সমর্থক। মনে মনে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-ছাত্ররা আরও এগিয়ে গেল। শুধু ব্লাডার নয়, এতে বলগুলো নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত। ঠিক হল, এমন কিছু করতে হবে—যাতে এগুলো নষ্ট না হয়। তখন চামড়ার কভার। মার্কিন কলোনীর সভ্যতার বিস্তার হল তাদেরই পিতৃপুরুষের দেশে—ইংল্যাণ্ডে।

আইন বলতে তখন কিছুই ছিল না। গোল পোস্টও ছিল না। একটা লাইন টানা ছিল। বল সেই লাইন অতিক্রম করলেই গোল। অবশ্য খেলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আইনও তৈরী হতে থাকে।

কে কতক্ষণ খেলবে, এমন কোন নিয়মও ছিল না। খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে একজনকে বসিয়ে অপরকে নামানো হত।

আরও কিছুদিন অতিক্রান্ত। স্কুলগুলোয় খেলার উন্নতি হল, ফুটবল হল জনপ্রিয়। আইনও তৈরী হল। একটি আইনে সকলেই ঐক্যমত হলেন। তা হল—বল কাছে রাখা চলবে না, একলা খেলাও নয়—অন্যকে অবশ্যই পাস দিতে হবে।

ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফুটবল প্রবেশ করে ১৮৪৬ সনে। কেমব্রিজে সকলকে ডাকা হল। বিরাট সভা। সেখানে বসে কতকগুলো সাধারণ নিয়মকানুন প্রস্তুত হল। রাগবীতে যেমন বলের পিছু দৌড়তে হবে তা, একেবারে নস্যাৎ করে দিল ঐ সভা। রাগবীর সব নিয়ম নাকচ হল। কিন্তু কেমব্রিজের আয়ু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। লণ্ডনের কেউ ঐ আইন কানুন মেনে চলতে চাইলেননা। তবে শেফিল্ড, ব্লাকহীথ, হ্যাম্পশায়ার, ওল্ড হ্যারোভিয়ান্স, ফরেষ্ট এস. সি ক্লাব এই নয়া আইনের ভীষণ পক্ষপাতী ছিলেন।

ব্লাকহীথ ছাড়া আর সকলে ২০জন নিয়ে দল গঠন করতেন। অফসাইড বলে কিছুই ছিল না। ব্লাডারের কভার তৈরী হত গরুর চামড়ায়।

১৮৬৩ তে কেমব্রিজে আবার সভা বসলো। এবার একরকম আইন তৈরীর জন্য কেউ কেউ উঠে পড়ে লাগলেন। ছাপানো হল আইন। লণ্ডনে আবার বৈঠক। নানারকম বাদপ্রতিবাদ, মতের গরমিলও যথেষ্ট। অবশেষে ফুটবলের সরকারী আইন হল—নাম দেওয়া হল 'রুল্‌স অফ্‌ দ্য লণ্ডন ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন 'এ্যাসোসিয়েশন গেম' বলেও এর পরিচিতি ছিল। এ্যাসোসিয়েশনকে আরও ছোট করে বলা হত 'সকার'। তারপর থেকে ফুটবলের অপর নাম 'সকার'।

শুধু ক্রীড়াজগতেই নয়, 'চিরঞ্জীব' এর খ্যাতি সুদূরপ্রসারী।

জন্ম : পূর্ব পাকিস্থানের খুলনায়। প্রকৃত নাম চিত্ত রঞ্জন বিশ্বাস। পড়াশুনা কলকাতায়। স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। 'চিরঞ্জীব' আনন্দ-বাজার পত্রিকার আবিষ্কার। বয়সে তরুণ হলেও ইতিমধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। সম্ভবতঃ তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ও 'সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক'। তার জনপ্রিয়তা শুধু 'মাঠ-ময়দানে'-সীমাবদ্ধ নয়। মূলতঃ তিনি সাংবাদিক, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ নিবন্ধেও তিনি সিদ্ধহস্ত। একদা ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার কলকাতার সংবাদদাতা এবং বর্ত্তমানে দুটি দৈনিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া বিদেশের বিভিন্ন কাগজেও লেখেন। সর্বত্রই ছদ্মনামে।